দাম : ষোলো টাকা

অরাজকতার অবসানে পশ্চিমবঙ্গের পরিবর্তন প্রয়োজন — পৃঃ ১৩

স্বস্তিকা

'লাভ জেহাদ' বিতর্ক এবং হিন্দু সমাজের উদ্বেগ — পৃঃ ১৭

৭৮ বর্ষ, ৩২ সংখ্যা।। ৬ এপ্রিল, ২০২৬।। ২২ চৈত্র, ১৪৩২।। যুগাব্দ - ৫১২৮।। website : www.eswastika.com

পশ্চিমবঙ্গকে রক্ষা করতে আপনার ভোট গুরুত্বপূর্ণ

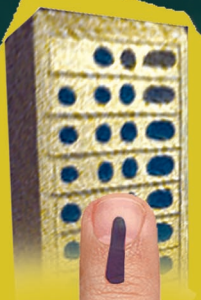

প্রথম দফায়
১৫২টি আসন
ভোট ২৩ এপ্রিল

দ্বিতীয় দফায়
১৪২টি আসন
ভোট ২৯ এপ্রিল

কুটুম্ব প্রবোধন → লক্ষ্য

যৌথ পরিবার

সংগঠিত পরিবার

সশক্ত পরিবার

সুস্থ পরিবার

সুরক্ষিত পরিবার

সমর্থ পরিবার

সম্পন্ন পরিবার

সুসংস্কৃত পরিবার

সমৃদ্ধ পরিবার

ব্যবস্থিত পরিবার

প্রভাবশালী পরিবার

আদর্শ পরিবার

প্রতিষ্ঠিত পরিবার

সন্তুষ্ট পরিবার

সুখী পরিবার

আনন্দিত পরিবার

আপনার এলাকায় কুটুম্ব প্রবোধন গতিবিধির কেন্দ্র খুলতে চাইলে
এই নম্বরে যোগাযোগ করুন— ৯৮৩৬৪৪৫৫২২ (9836445522)

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৮ বর্ষ ৩২ সংখ্যা, ২২ চৈত্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

৬ এপ্রিল - ২০২৬, যুগাব্দ - ৫১২৮

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ☐ ৫

ক্যাচেস উইন ম্যাচেস, তাই ম্যান অফ দ্য সিরিজ নির্বাচন কমিশন— লজ্জা ঘৃণা ভয় ☐ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ☐ ৬

নারী সুরক্ষায় অভিন্ন দেওয়ানি বিধির ভূমিকা ☐ অজয় ভট্টাচার্য ☐ ৭

কমিউনিস্ট ইতিহাসবিদদের রচিত ভারতের বিকৃত ইতিহাস পুনর্লিখনের সময় এসেছে ☐ অভিজিৎ দেব ☐ ৮

পশ্চিমবঙ্গকে রক্ষা করতে আপনার মূল্যবান ভোট গুরুত্বপূর্ণ ☐ আনন্দ মোহন দাস ☐ ১১

অরাজকতার অবসানে পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তন প্রয়োজন ☐ প্রণবজ্যোতি ভট্টাচার্য ☐ ১৩

শেষ সুযোগ-২০২৬ : পরিবর্তন না এলে কী অপেক্ষা করছে পশ্চিমবঙ্গের জন্য ? ☐ সাধন কুমার পাল ☐ ১৫

'লাভ জেহাদ' বিতর্ক এবং হিন্দু সমাজের উদ্বেগ, বাস্তবতা, ধারণা ও প্রেক্ষাপট ☐ অরুণ কুমার চক্রবর্তী ☐ ১৭

নরেন্দ্র মোদী বর্তমান ভারতের প্রেরণাপুরুষ ☐ মণীন্দ্রনাথ সাহা ☐ ২৩

ড. শ্যামাপ্রসাদকে লেখা কাজী নজরুল ইসলামের শেষ চিঠি ☐ অমিত দাশ ☐ ২৫

হারানো পত্রিকা—অতুলপ্রসাদের মানসসন্তান উত্তরা ☐ নন্দলাল ভট্টাচার্য ☐ ৩১

অকালবোধন ও বাসন্তীপূজা ☐ সুস্মিতা সেন ☐ ৩৪

পরিবর্তনের এক সুবর্ণ সুযোগ বাঙ্গালির সামনে ☐ রবিশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় ☐ ৩৫

বাংলাদেশে তারেক জিয়ার প্রধানমন্ত্রিত্বে সংখ্যালঘুদের কি ভাগ্যের পরিবর্তন হবে ? ☐ রঞ্জন কুমার দে ☐ ৩৭

আমরা কি এই পরিবর্তনই চেয়েছিলাম ? ☐ অজিত ভকত ☐ ৩৯

সঙ্ঘ শতবর্ষের আলোকে কিছু স্মৃতিচারণ ☐ কঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ☐ ৪৩

ধ্বংসের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের ভোটের ইস্যু এবার একটাই ☐ কৌটিল্য ☐ ৪৮

আসন্ন নির্বাচনে এই অপশাসনের অবসান হলেই পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদের রাহুমুক্তি ঘটবে ☐ সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী ☐ ৪৯

গল্প কথায় ডাক্তারজী ☐ সংকলক—বিমলকৃষ্ণ দাস ☐ ৫০

নিয়মিত বিভাগ :

☐ **চিঠিপত্র : ১৯-২০** ☐ **অঙ্গনা : ২১** ☐ **সুস্বাস্থ্য : ২২** ☐ **সমাবেশ সমাচার : ২৬-৩০** ☐ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১** ☐

প্রকাশিত হবে ১৩ এপ্রিল ২০২৬

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ১৩ এপ্রিল ২০২৬

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

বাংলা নববর্ষ

আগামী সংখ্যা বাংলা নববর্ষ সংখ্যা। এই সংখ্যায় একদা বঙ্গ তথা ভারতের নবজাগরণের নেতৃত্বদানকারী বাঙ্গালির সাম্প্রতিক অবনমনের কারণ এবং তার থেকে উত্তরণের উপায় বিষয়ে আলোচনা করবেন ড. জিষ্ণু বসু, শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী, ডা: মধুসূদন পাল, প্রবীর ভট্টাচার্য, অম্লান কুসুম ঘোষ প্রমুখ।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market Kolkata-700 006**

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার বার্ষিক গ্রাহকদের প্রতি সপ্তাহে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০/ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ২১০০/ টাকা (মোট ২৮০০/) টাকা পাঠাতে হবে।

যে সকল গ্রাহক প্রতি মাসের পত্রিকা (৪/৫টি) একত্রে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিতে ইচ্ছুক তাদের গ্রাহক মূল্য ৭০০/ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ৫৫০/ টাকা (মোট ১২৫০ টাকা) পাঠাতে হবে।

যোগাযোগ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫ ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

হিন্দু সমাজের অস্তিত্ব রক্ষার নির্বাচন

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বাজিয়া গিয়াছে। নির্বাচন কমিশন গত ১৫ মার্চ নির্বাচনের নির্ঘণ্টও ঘোষণা করিয়াছে। এবার রাজ্যে দুই দফায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে— প্রথম দফায় ২৩ এপ্রিল ১৫২ আসনে এবং দ্বিতীয় দফায় ২৯ এপ্রিল ১৪২ আসনে। বর্তমান বিধানসভার মেয়াদ শেষ হইবে ৭ মে। কাজেই ভোট গণনার তারিখ ঘোষণা হইয়াছে ৪ মে। রাজ্যে সরকার গড়িবার জন্য রাজনৈতিক দলগুলিতে সাজো সাজো রব পড়িয়া গিয়াছে। প্রচারও জোর কদমে শুরু হইয়াছে। বলা হইয়া থাকে, ভারতের নির্বাচন প্রক্রিয়া বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক উৎসব। রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনও তাহার ব্যতিক্রম নহে। কিন্তু নির্বাচন এখন আর উৎসবের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া সত্য সত্যই যুদ্ধের রূপ ধারণ করিয়াছে। বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে। গণতন্ত্রের এই উৎসবকে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে পরিবর্তিত করিবার কৃতিত্ব অবশ্যই বাম দলগুলির। তাহারাই এই যুদ্ধকে পাড়ায়-পাড়ায়, পরিবারে-পরিবারে, ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে, এমনকী ভ্রাতৃঘাতী সংগ্রামে পরিণত করিয়াছে। আক্ষরিক অর্থেই ইহা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। বাম শাসনকালে সারা বৎসরই রাজ্যে যুদ্ধের এক ভয়ঙ্কর পরিবেশ বিরাজ করিত। নির্বাচন উপলক্ষ্যে তাহা আবার ভীষণ আকার ধারণ করিত। তাহাদের হার্মাদ বাহিনী বোমাবাজি করিয়া নিরীহ ভোটারদিগকে গৃহবন্দি করিয়া রাখিত। কেহ প্রতিবাদ করিবার চেষ্টা করিলে তাহাকে প্রাণে মারিয়া ফেলা হইত। ভোটের দিন পাড়ায় পাড়ায় এবং প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে তাহাদের তাণ্ডবে যুদ্ধক্ষেত্রের আকার ধারণ করিত সম্পূর্ণ রাজ্য। উৎসবকে বিষাদে পরিণত করিত তাহারা। তাহারা বিদায় লইবার পরও নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া রাজ্যে রক্তের হোলিখেলা বন্ধ হয় নাই। বরং তাহা শত-সহস্রগুণে বৃদ্ধি করিয়াছে বর্তমান শাসক দল। বাম শাসনের ন্যায়ই নির্বাচনের দিন তো বটেই, নির্বাচন-পরবর্তী সময়েও চলিতে থাকে তাহাদের তাণ্ডব। এই কার্যে তাহারা প্রধান সহায়ক করিয়াছে জেহাদি গোষ্ঠীকে। ২০২১ সালের নির্বাচন-পরবর্তী হিংসা দেখিয়া সমগ্র দেশ শিহরিয়া উঠিয়াছিল। সেই সময় বহু মানুষকে শাসক দলের গুন্ডারা প্রাণে মারিয়াছে, কয়েক হাজার মানুষকে ঘরছাড়া করিয়াছে। তাহাদের অত্যাচারের মাত্রা এতই তীব্র ছিল যে বহু মানুষকে তাহাদের পরিবার পরিজন লইয়া অন্য রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ২০২৩ সালের রাজ্য পঞ্চায়েত নির্বাচনেও বহু মানুষকে হত্যা করিয়াছে তাহারা। এক সময় বিহার রাজ্যে এই প্রকার হিংসা চলিত। সেই সময় বিহারের শাসনকে 'জঙ্গলের রাজত্ব' নামে অভিহিত করা হইত। বিহারের জনগণ কিন্তু সেই অপশাসনের অবসান ঘটাইয়া সুশাসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের শাসন বিহারের সেই জঙ্গলের শাসনকেও ম্লান করিয়া দিয়াছে। আর ইহা একাদিক্রমে এক দশকের অধিককাল ধরিয়া চলিতেছে। পশ্চিমবঙ্গবাসীর পক্ষে ইহা চরম লজ্জার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য।

শুধু পশ্চিমবঙ্গে নহে, সারা দেশের নির্বাচন প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার দায়িত্ব থাকে নির্বাচন কমিশনের উপর। সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই কমিশন কয়েক বৎসর পর পর বিশেষ নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধন করিয়া থাকে। এবার পশ্চিমবঙ্গ ব্যতীত আরও এগারোটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। সমস্ত রাজ্য সরকার তাহাতে সহযোগিতা করিয়াছে। ব্যতিক্রম শুধু পশ্চিমবঙ্গ। এই রাজ্যে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী এই প্রক্রিয়াতে পদে পদে বাধা সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহার ফলে এই প্রক্রিয়া বিলম্বিত হইয়াছে। অদ্যাবধি সেই প্রক্রিয়া চলিতেছে। তাহা সত্ত্বেও নির্বাচন কমিশন এই রাজ্যে নির্বাচনের দিন ক্ষণ ঘোষণা করিয়াছে। রাজ্যে রক্তপাতহীন নির্বাচনের লক্ষ্যে যাবতীয় ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করিয়াছে। কমিশন ইতিমধ্যে কয়েক কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করিয়াছে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে। তাহা সত্ত্বেও শাসক দলের হিংসাত্মক কার্যকলাপ বন্ধ হয় নাই। ভোট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনিয়মের বিরুদ্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করা কর্মীকে রক্তাক্ত করা অথবা নির্বাচনী প্রচারের সময় বিরোধী পক্ষের নেতা-কর্মীদের উপর আক্রমণ করা, সমস্তই অবাধে চলিতেছে। সাধারণ ভোটাররা ভীত হইয়া পড়িয়াছেন এই ভাবিয়া যে, নির্বাচন কমিশনের এত তৎপরতা সত্ত্বেও কি এই নির্বাচন অবাধ ও শান্তিপূর্ণ হইবে? রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, রক্ষকই যেখানে ভক্ষক সেখানে শান্তিপূর্ণ ও রক্তপাতহীন নির্বাচন আশা করা বাতুলতা মাত্র। এমতাবস্থায় শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ভোটারগণ শত শতাংশ ভোট দান করিতে পারিলেই যে এই অপশাসনের অবসান ঘটিতে পারে তাহা একেবারে নিশ্চিত করিয়া বলা যাইতে পারে। আসন্ন নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এই নির্বাচনই নির্ধারণ করিবে এই রাজ্যে হিন্দু সমাজ তাহাদিগের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারিবে কিনা।

সুভাষিতম্

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্।। (গীতা-১২।১২)

অর্থ ঃ মর্ম না জেনে শুধুমাত্র অভ্যাস করা হতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ; জ্ঞান হতে পরমেশ্বরের স্বরূপের ধ্যান শ্রেষ্ঠ; ধ্যান অপেক্ষা সর্বকর্মের ফল ত্যাগ শ্রেষ্ঠ। কারণ ত্যাগের দ্বারাই অবিলম্বেই পরম শান্তি লাভ হয়।

ক্যাচেস উইন ম্যাচেস, তাই ম্যান অফ দ্য সিরিজ নির্বাচন কমিশন

লজ্জা ঘৃণা ভয়

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

২০২৬-এর পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভা ভোট মর্যাদা বনাম অস্তিত্বের লড়াই। বিজেপি আর তৃণমূল কংগ্রেস। ক্রিকেট বইতে আছে ক্যাচেস উইন ম্যাচেস। ২০২৬-এর রাজ্য ভোটে নির্বাচন কমিশন তাই করেছে। তৃণমূলের কঠিন ক্যাচ বা জল ভোট তারা ধরেছে । এখনও পর্যন্ত প্রায় ৭৯ লক্ষ মৃত, স্থানান্তরিত ও ভুয়ো ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে। বিচারাধীন ভোটারদের স্ক্রুটিনি শেষ হলে সংখ্যাটা কোটির কাছে পৌঁছতে পারে। পারিবারিক দল তৃণমূল কংগ্রেস ভাবেনি যে তাদের 'খেলা' শেষ হবে। ২০১৬-র স্লোগান তারা ছেড়ে দিয়েছে। ২০১১-তে কমিশন এই ক্যাচ ধরেছিল। তাই তৃণমূল ক্ষমতায় আসে। পাঁচ রাজ্যের ১৭ কোটি ভোটারের ৩৮ শতাংশ পশ্চিমবঙ্গের। ২০১১ সালে 'এসআইআর' ছিল না। বুথের ভিতরে ও বাইরে নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো করে বিদেশি বামেদের জল ভোট আটকে দেয় কমিশন। বামেদের অনেক ভোট সেবার তৃণমূলের চিহ্নে পড়ে। সব মিলিয়ে বামেদের ১০ থেকে ১১ শতাংশ ভোট সরে যায়। ফলে বিদেশি বামেরা হেরে যায়।

২০১১ সালে ৩৯ শতাংশ ভোট পেয়ে তৃণমূল যেখান থেকে শুরু করেছিল ২০২৬-এ বিজেপি ঠিক সেখান থেকেই শুরু করছে। ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রের ভিতর কেবল ভবানীপুরে ব্যক্তিকেন্দ্রিক লড়াই। বাকি সব কেন্দ্রেই জেতার লড়াই। ভবানীপুরে মর্যাদা বনাম অস্তিত্বের লড়াই। তৃণমূলনেত্রী জিতলে তার রাজনৈতিক অস্তিত্ব রক্ষা পাবে আর হারলে শুভেন্দুবাবুর মর্যাদা বাড়বে। একটি বাদে রাজ্যের সব বড়ো বাংলা টেলিভিশন নিউজ চ্যানেল শাসকের ডগ স্কোয়াড। প্রায় সাত কোটি ভোটারের মনোভাব তারা সাত হাজার ভোটারের নমুনা সমীক্ষা বা স্যাম্পল্ সার্ভের ভিতর দিয়ে ব্যাখ্যা করে প্রথম দফায় তৃণমূলকে জিতিয়ে দিয়েছে। ব্যবসার খাতিরে তৃণমূলের পরামর্শদাতারা তাদের তেমনটাই করতে বলেছে। তৃণমূলের নেতারা দাবি করেছেন প্রার্থীপদ পেতে তাদের ২০ লক্ষ থেকে চার কোটি পর্যন্ত খরচ করতে হয়েছে। তৃণমূলের ভাঁড়ে মা ভবানী। নির্বাচনী লড়াইয়ের খরচটুকু নাকি তাদের নেই। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলি তাদের সাপ্লাই লাইন কেটে দিয়েছে। তাই চাকরি চুরির মতো তারা প্রার্থী চুরি চালু করেছে।

৩৪ বছরে এ রাজ্যে সিপিএম সর্বোচ্চ ৩৯ শতাংশ ভোট পায়। ২০১১-তে তা ৩০ শতাংশে নেমে আসে। অনেকের মতানুসারে, তিন দফায় ক্ষমতায় থাকা তৃণমূলের প্রাপ্ত ভোটের মধ্যে যে ১২-১৫ শতাংশ জল ভোট ঢুকে রয়েছে তা বের করা বা আটকানো কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষে প্রায় অসম্ভব যদি না কোনো সাংবিধানিক সংস্থা এই জল বের করতে সচেষ্ট হয়। অনেকের দাবি তৃণমূলের এতটাই বদনাম হয়ে গিয়েছে যে, তাদের হয়তো এবারের লড়াই শুরু করতে হচ্ছে ৩০-৩২ শতাংশ ভোট হাতে নিয়ে। এ রাজ্যে এতদিন ধরে মুসলমান ভোট পড়ে ৩৩ শতাংশ। এসআইআর-এর চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর দেখা যাচ্ছে ভোটার তালিকায় মুসলমানের সংখ্যা প্রায় ২২ শতাংশ। এই ধরনের তথ্যগুলি থেকেই আন্দাজ করা যায় যে, ৫ রাজ্যে এসআইআর নিয়ে কোনো সমস্যা না থাকলেও তৃণমূলনেত্রীর দুধেল গাইয়েরা কীভাবে তাকে সাহায্য করে।

অ্যাডজুডিকেশনে আটকে যাওয়া ভোটারদের একটা বড়ো অংশ 'ডাউটফুল ফরেনার' বা বেআইনি অনুপ্রবেশকারী। দু'কান কাটা কথাটি এ রাজ্যের শাসককে মানায় না। একসময় রাজ্যপাটে লেখা হয়েছিল কতটা নীচে নামলে তবে 'তৃণমূলনেত্রী' হওয়া যায়। সময়ের সঙ্গে তাল না মিলিয়েও বলা চলে উক্তিটি ভুল ছিল না। তবে তারও তলানি রয়েছে। ভোটার তা হাড়ে মজ্জাতে বুঝছে, যদিও নেত্রীর স্তাবকদের ধারণা এসআইআর-এর নেতিবাচক প্রভাবে তৃণমূলের পুনরুত্থান ঘটবে! সর্বস্তরে কান আর নাকমলা তৃণমূল সরকারের গা সওয়া হয়ে গিয়েছে। সুপ্রিম আদালতে বারবার প্রত্যাখ্যাত, অপমানিত আর লজ্জিত হয়েও সম্বিৎ ফেরেনি। ভোটারকে ধোঁকা দিয়ে জিতে আসাটাই তাদের প্রধান উদ্দেশ্য। হবে নাই-বা কেন? রাজ্যের মানুষের কাছে ২০১১ ছিল সবচাইতে বড়ো ধোঁকা। তাদের উল্টোদিকে সর্বভারতীয় বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইটা যে তৃণমূলনেত্রীর মতো কোনো নাট্যকারের হাতের পুতুল নয় তা বুঝে ফেলেছে রাজ্যবাসী। তৃণমূলকে কারা ভোট দেন? বিজেপিকেই-বা কারা? যদি শিক্ষার বা মানের তারতম্য করা হয়, তবে সে প্রতিযোগিতা হবে বাতুলতা। ভোট পাঁচ বছরের দলীয় শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই। জেতায় গুরুত্বের পাশাপাশি স্থায়িত্বেও জোর দিতে হয়। তৃণমূল আর বিজেপি-র তফাত স্থায়িত্বে। কংগ্রেসের উচ্ছিষ্ট হিসেবে সৃষ্টি হয়েছিল তৃণমূল। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি-র উত্থান রাজনৈতিক পটভূমিতে। ব্যক্তিগত রাজনৈতিক আক্রোশের ফসল হয়ে নয়। 'লজ্জা ঘৃণা ভয়, তিন থাকতে নয়'— কথাটির উল্টো ভাবনায় সঞ্জাত সন্তান তৃণমূল। তৃণমূলের বাঙ্গালিত্বের বাগাড়ম্বরে ২০১৬ ও ২০২১-এর ভোটে বিজেপিকে কিঞ্চিৎ সমস্যায় পড়তে হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ আর বাঙ্গালি সে তৃণমূলকে আর চেনে না। ১৫ বছরে পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতি, লুঠতরাজ, অপশাসন, জেহাদি তোষণের পর তৃণমূলের বাঙ্গালি-বিরোধী চরিত্র আজ রাজ্যবাসীর সামনে স্পষ্ট। রাজ্যের ইতিহাস বলে কিছু পাল্টাতে সময় নেয় বাঙ্গালি। যদিও এ যুগের 'বাঙ্গালি' সে বাঙ্গালি নয়। নতুন বাঙ্গালি ওল্টাতে আর পাল্টাতে জানে কিনা আগামী ৪ মে বোঝা যাবে।

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

নারী সুরক্ষায় অভিন্ন দেওয়ানি বিধির ভূমিকা

অজয় ভট্টাচার্য

১৯৯০ সালের একটি সমীক্ষায় জানা গিয়েছে, প্রায় ১০০ মিলিয়ন নারী পৃথিবীর জনসংখ্যা থেকে উধাও হয়েছেন। কিন্তু কেন? কোথায় গেলেন তাঁরা? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতে আমরা পৌঁছে যাব এক দেশ এক আইনে। তার আগে অর্থনৈতিক কারণগুলি জানা প্রয়োজন।

পুরুষের তুলনায় নারী দীর্ঘায়ু হন। তাঁদের জীবনীশক্তিও তুলনামূলকভাবে বেশি হয়। স্বাভাবিকভাবেই মোট জনসংখ্যার মধ্যে পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা বেশি হওয়া উচিত। সমীক্ষা অনুযায়ী, সেই সময়ে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকাতে ১০০ জন পুরুষ পিছু ১০৫ জন নারী ছিল। কিন্তু চীন ও বাংলাদেশে ছিল ১০০ জন পুরুষ পিছু ৯৪ জন নারী এবং পাকিস্তানে ছিল ১০০ জন পুরুষ পিছু ৯০ জন নারী। শেষোক্ত ফলাফলগুলি মোটেও অভিপ্রেত ছিল না। কিন্তু কেন এরূপ হলো? এর উত্তর একটি গবেষণা থেকে পাওয়া যায়। অর্থনৈতিক বৈষম্য, অপুষ্টি ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা না পাওয়ার জন্যই পুরুষের তুলনায় নারীর সংখার এই ক্ষয়িষ্ণু ফলাফল।

বলতে দ্বিধা নেই যে, পারিবারিক ও সামাজিক সম্পদ কখনোই নারী-পুরুষে সমভাবে বণ্টিত হয়নি। বরং পুরুষরাই বেশি পেয়ে এসেছে। প্রচলিত ধারণায় পুরুষকে মনে করা হয় পরিবারের কর্তা। স্ত্রী ও সন্তান তাঁর ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ পরিবারের কর্তাই আয়ের উৎস। তাই একসময় অর্থনীতিবিদরা পরিবারের কর্তা তথা পুরুষ সদস্যের প্রতি তাঁদের নজর কেন্দ্রীভূত করে রাখতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে যায়। তাই এখন কেবলই পরিবারের কর্তা-কে কেন্দ্র করে অর্থনীতির চাকা আবর্তিত হয় না। পরিবারের স্ত্রী-সন্তান, এরাও সম্পদ সৃষ্টির উৎস। এঁদের শ্রম ও সৃষ্টিও পণ্যের মর্যাদা পায়।

এখন প্রশ্ন হলো, পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা ক্রমহ্রাসমান হওয়ার আর কি কোনো বিশেষ কারণ আছে? নাকি উপরে যে কারণগুলি বলা হলো, শুধু তাই-ই। না, আরও একটি কারণ আছে। কারণটি হলো পুরুষের বহুবিবাহ, যা অবৈবাহিক সূত্রে বা বৈবাহিক সূত্রে হতে পারে। বর্তমান আলোচনা শুধু বৈবাহিক সূত্রে একাধিক স্ত্রী রাখার অধিকার বিষয়ে। যেখানে একজন পুরুষের একই সঙ্গে একাধিক স্ত্রী রাখা আইন-স্বীকৃত, সেখানে বঞ্চিত নারীর সংখ্যাও বেশি হওয়াটাই স্বাভাবিক। নারীর বঞ্চনার যে কারণগুলি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছিল সেই কারণগুলির সবকটিই বহুবিবাহের উপজাত কুফল, একথা অস্বীকার করা যায় না। বহুবিবাহ ছাড়াও সমাজে নারী-বঞ্চনা ওতপ্রোতভাবে জড়িত, একথা অস্বীকার করা যায় না।

ভারতের মতো দেশেও শরিয়তি আইন অনুসারে মুসলমান পুরুষদের জন্য বহুবিবাহ স্বীকৃত অথচ হিন্দু বিবাহ আইন-১৯৫৫ অনুসারে, হিন্দু-সহ শিখ, বৌদ্ধ, জৈন ধর্মাবলম্বী মানুষদের বহুবিবাহ নিষিদ্ধ। ১৮৬০-এর পেনাল কোড অনুসারে সেক্ষেত্রে উপযুক্ত শাস্তিবিধানের ব্যবস্থা আছে। এমনকী সেকশন ৪৯৪ ও ৪৯৫ অনুসারে প্রথমপক্ষের স্ত্রী থাকা অবস্থায় দ্বিতীয়বার বিবাহ করাটাও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। খ্রিস্টান, পারসি উপাসনাপদ্ধতি অনুসারে এসব নিষিদ্ধ। একমাত্র শরিয়তি আইন ভারতীয় মুসলমানদের সুরক্ষা কবচ দেয়। ইসলামে একসঙ্গে চারজন বিবি রাখার অনুমতি দেয়। যদিও স্ত্রীদের প্রতি সমান অধিকার দেওয়ার কথাও বলা আছে।

দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিলের মতে, ব্যক্তিস্বাধীনতা যেন এমন না হয়, যা অপরের ক্ষতি করে বা সমাজের ক্ষতি করে। সুতরাং ব্যক্তি স্বাধীনতার নাম করে বহুবিবাহকে চালিয়ে দেওয়া যায় না। বহুবিবাহ সমাজের ক্ষতি করে। বহুবিবাহ সমাজের ক্ষতি করে, নারীর সম্মান হানি করে, নারীকে অবদমিত করে। আবার ভারতীয় সংবিধানের ২১নং অনুচ্ছেদ অনুসারে সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকার অধিকার সবার আছে। বহুবিবাহের কুফল নারীকে সম্মান-সহ বেঁচে থাকার অধিকার দেয় না। সঙ্গত কারণে উত্তরাখণ্ড রাজ্যে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বলবৎ হয়েছে। বহুবিবাহ বন্ধ করার প্রস্তাব অসম রাজ্যেও গৃহীত হয়েছে। বিজেপি নির্বাচনী সংকল্পপত্রে ইস্যুটিকে রেখেছে। স্বাভাবিকভাবে এই নিয়ে শুরু হয়েছে দেশজুড়ে বিতর্ক। বিজেপি বিরোধী দলগুলির যুক্তি হলো, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বলবৎ করার মাধ্যমে বিজেপি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার খর্ব করছে। অপরপক্ষে বিজেপির যুক্তি হলো, লিঙ্গবৈষম্য দূর করার জন্য এটি ভারতের সর্বত্র বলবৎ হওয়া প্রয়োজন।

তাছাড়া নারীর সম্মান রক্ষার্থে দেশব্যাপী অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকর হওয়া একান্ত প্রয়োজন। শিক্ষিত মুসলমান সমাজও একই সঙ্গে একাধিক স্ত্রী রাখার বিষয়টিকে মান্যতা দেন না। সর্বোপরি বহুবিবাহ কোনো ধর্মের আবশ্যিক প্রথা নয়। মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের মতে বিষয়টি কোনো মৌলিক ধর্মীয় আচরণের মধ্যেও পড়ে না। তা সত্ত্বেও বিরোধী দলগুলির অযাচিত ওকালতি নারীর মর্যাদায় আঘাত হানে। শুধু বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা না করে সমাজের তথা দেশের ভালোর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলিকে সমর্থন করা উচিত। এক দেশ এক আইন কেবলই নারীর সম্মান বৃদ্ধির সহায়ক হবে তা নয়, মানুষে-মানুষে ভেদাভেদ দূর করার জন্যেও প্রয়োজন। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি সকল ভারতীয় নাগরিকের জন্য একই আইনি অনুশাসনের কথা বলে। ভিন্ন ভিন্ন উপাসনা পদ্ধতির ভিন্ন ভিন্ন আইনি অনুশাসনের অবলুপ্তি ঘটিয়ে সকল নাগরিককে একই আইনের আওতায় নিয়ে আসার এক মহৎ প্রস্তাব। দেশের সংহতির পক্ষে যা হবে যথেষ্ট ইতিবাচক। □

কমিউনিস্ট ইতিহাসবিদদের রচিত ভারতের বিকৃত ইতিহাস পুনর্লিখনের সময় এসেছে

অভিজিৎ দেব

ভারতের স্বাধীনতা-উত্তর ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এক গভীর ও সুদূরপ্রসারী বিতর্ক বিদ্যমান। মার্কসবাদী ঐতিহাসিকদের ভূমিকা এবং তাদের রাজনৈতিক আনুগত্যকে কেন্দ্র করে মূলত আবর্তিত হয় এই বিতর্ক। অভিযোগ যে, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অনুগত একদল ঐতিহাসিক ও বুদ্ধিজীবী দেশের প্রকৃত ইতিহাসকে আড়াল করে একটি বিশেষ চিন্তাধারার ছাঁচে ঢালা বিকৃত ইতিহাস জনগণের সামনে উপস্থাপন করেছেন । এই ইতিহাসচর্চার মূলে ছিল দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ এবং শ্রেণী সংগ্রামের ধারণা, যা ভারতীয় সভ্যতার সনাতনী ধারাবাহিকতা ও সাংস্কৃতিক পরিচয়কে খাটো করে দেখানোর লক্ষ্যে নিরন্তরভাবে চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছে। ১৯৪০-এর দশক থেকে এই ধারার সূচনা হলেও ১৯৬০ থেকে ১৯৯০-এর দশক পর্যন্ত ভারতের প্রধান প্রধান শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোতে মার্কসবাদী ইতিহাসবিদদের নিরঙ্কুশ প্রভাব ছিল।

মার্কসবাদী ইতিহাসচর্চা মূলত দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, যেখানে ইতিহাসের চালিকাশক্তি হিসেবে অর্থনৈতিক কাঠামো এবং উৎপাদন পদ্ধতিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। ভারতের ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির প্রয়োগ শুরু করেন রজনী পাম দত্ত, যার ১৯৪০ সালে প্রকাশিত 'ইন্ডিয়া টুডে' গ্রন্থটি এই ধারার প্রথম মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয়। পরবর্তীকালে ডিডি কোসাম্বী এই ধারার প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি মজবুত করেন। তাদের তাত্ত্বিক কাঠামো অনুযায়ী, ভারতীয় ইতিহাসকে প্রাচীন, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের পরিবর্তে বিভিন্ন উৎপাদন পদ্ধতির বিবর্তন হিসেবে দেখা হয়। এই তাত্ত্বিক পদ্ধতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো 'মহান ব্যক্তি তত্ত্ব' বা 'গ্রেট ম্যান থিওরি'কে প্রত্যাখ্যান করা। মার্কসবাদী ইতিহাসবিদরা ভারতের রাজা বা সম্রাটদের ব্যক্তিগত গুণাবলী বা বীরত্বকে অস্বীকার করে সেগুলোকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর ফল হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। এর ফলে ভারতীয় ইতিহাসের অনেক বীরগাথা এবং বিভিন্ন যুগে আবির্ভূত জাতীয় স্তরের নেতাদের ভূমিকা গৌণ হয়ে পড়ে। ১৯৫০ এবং '৬০-এর দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে নেহরু সরকারের ঘনিষ্ঠতা এবং পরবর্তীকালে ইন্দিরা গান্ধীর আমলে কমিউনিস্টদের সঙ্গে রাজনৈতিক জোটের ফলে এই বামপন্থী ইতিহাসবিদরা কেন্দ্রীয় সরকারের অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করেন। এতে স্বাধীনতার পর বিভিন্ন শাসনামলে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো মার্কসবাদী ইতিহাসবিদদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়, আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ হিস্টোরিক্যাল রিসার্চ এই ভাবধারার প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। বিশেষ করে ১৯৭০-এর দশকে অধ্যাপক নুরুল হাসান শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালীন এই আধিপত্য প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়। এই ঐতিহাসিকরা এক ধরনের 'এলিট ক্লাব' বা গোষ্ঠী তৈরি করেছিলেন, যে গোষ্ঠী তাদের চিন্তাধারার পরিপন্থী যে কোনো মৌলিক গবেষণাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করার ক্ষমতা রাখত। অরুণ শৌরী তার গবেষণায় দেখিয়েছেন কীভাবে এই ইতিহাসবিদরা সরকারি অর্থ ব্যবহার করে একে অপরের বইয়ের প্রশংসা করতেন এবং স্কুল-কলেজের পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে ভারতের ইতিহাসের একটি নির্দিষ্ট বয়ান দেশবাসীর ওপর চাপিয়ে দিতেন। যাঁরা এই ধারার বাইরে গিয়ে সত্যনিষ্ঠ ইতিহাস রচনায় উদ্যোগী হয়েছিলেন, যেমন যদুনাথ সরকার, সুরেন সেন বা ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, তাদেরকে 'সাম্প্রদায়িক' বা 'প্রতিক্রিয়াশীল' তকমা দিয়ে মূলধারার শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে মার্কসবাদী ইতিহাসবিদদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড়ো অভিযোগ হলো তারা ইচ্ছাকৃতভাবে আর্যদের বহিরাগত হিসেবে প্রমাণের জন্য মরিয়া চেষ্টা চালিয়েছে। উনিশ শতকে ঔপনিবেশিক শক্তির দ্বারা প্রণীত 'আর্য আক্রমণ তত্ত্ব' যা ব্রিটিশদের সাম্রাজ্যবাদী নীতিকে বৈধতা দান করত, মার্কসবাদী ইতিহাসবিদরা তা অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে সংরক্ষণ করেছেন এবং দশকের পর দশক ধরে এই ধরনের ভিত্তিহীন তত্ত্বের ব্যাপক প্রচার-প্রসার চালিয়ে গিয়েছেন। আরএস শর্মা এবং রোমিলা থাপারের মতো ইতিহাসবিদরা বারবার বলার চেষ্টা করেছেন যে, আর্যরা বাইরে থেকে এসে ভারতের আদি বাসিন্দাদের ওপর তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতি চাপিয়ে দিয়েছে। অথচ প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা যখন সরস্বতী নদীর অস্তিত্ব এবং সিন্ধু-সরস্বতী সভ্যতার নিরবচ্ছিন্নতা প্রমাণ করতে শুরু করে, তখন এই ইতিহাসবিদরা সেই প্রমাণগুলোকে জোরপূর্বক অগ্রাহ্য করেন। তাদের যুক্তি ছিল সরস্বতী নদী একটি পৌরাণিক কল্পনা মাত্র। সরস্বতী নদীর অস্তিত্ব স্বীকার করলে 'আর্যরা বহিরাগত'— এই তত্ত্ব ভুল প্রমাণিত হয়। এর ফলে তাদের শ্রেণী সংগ্রামের বয়ান যে মিথ্যা, তাও ধরা পড়ে যায়। এর ফলে স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তকে বছরের পর বছর ধরে ভুল তথ্য পড়ানো হয়েছে এবং ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব ও গুরুত্বকে খাটো করে দেখানো হয়েছে।

মার্কসবাদী ইতিহাস রচনার অন্যতম বিতর্কিত দিক হলো ভারতের মধ্যযুগীয় ইতিহাসের চিত্রায়ণ। অভিযোগ রয়েছে যে, তারা ইসলামিক আক্রমণকারীদের ভয়াবহতা এবং ভারতের হিন্দু মন্দির ধ্বংসের ঘটনাগুলোকে সুকৌশলে আড়াল করেছেন বা লঘু করে দেখিয়েছেন। এই প্রক্রিয়ায় তারা ধর্মনিরপেক্ষতার এক অদ্ভুত সংজ্ঞায়ন করেছেন, যেখানে আক্রান্তের যন্ত্রণার চেয়ে আক্রমণকারীর অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটকে বেশি

গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বামপন্থী ইতিহাসবিদ রোমিলা থাপার সোমনাথ মন্দিরের ধ্বংসলীলাকে মজহবি উন্মাদনার বদলে অর্থনৈতিক লুণ্ঠন হিসেবে বর্ণনা করেছেন। একইভাবে ঔরঙ্গজেবের মন্দির ধ্বংসের ঘটনাগুলোকে রাজনৈতিক বিদ্রোহ দমনের কৌশল হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই ইতিহাসবিদরা যুক্তি দিয়েছেন, সেই সময় মন্দিরগুলো ছিল অঢেল ধন-সম্পদের আধার, তাই ইসলামি শাসকরা শুধুমাত্র লুঠের উদ্দেশ্যে সেখানে আক্রমণ চালিয়েছে। অথচ সমসাময়িক ইসলামিক ঐতিহাসিকদের লেখায় স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে তারা মজহবি যুদ্ধ বা 'জেহাদ' হিসেবেই এই ধ্বংসলীলা চালিয়েছিল। মার্কসবাদী ঐতিহাসিকরা এই মজহবি উন্মাদনাকে মুছে ফেলে ইতিহাসকে শুধুমাত্র শ্রেণীসংঘাতের দর্পণে উপস্থাপন করেছেন। মার্কসবাদী ও নেহরুভিয়ান ইতিহাসবিদরা 'গঙ্গা-যমুনি তহজিব' বা মিশ্র সংস্কৃতির একটি মিথ গড়ে তুলেছেন। এই আখ্যান অনুযায়ী, মধ্যযুগীয় ভারত ছিল এক শান্তি ও সম্প্রীতির লীলাভূমি যেখানে ইসলামি শাসকরা ছিলেন শিল্প ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। এই ধারণা প্রচার করতে গিয়ে তারা সুকৌশলে জোরপূর্বক ধর্ম পরিবর্তন এবং জিজিয়া করের মতো বৈষম্যমূলক পদক্ষেপগুলোকে আড়ালে রেখে দিয়েছেন। বর্তমানকালে জে সাই দীপকের মতো গবেষকরা মনে করেন, এই কৃত্রিম সংস্কৃতি মূলত একটি রাজনৈতিক প্রজেক্ট ছিল যাতে আধুনিক ভারতে ভোটব্যাংক রাজনীতি এবং কমিউনিস্ট ভাবধারাকে তাত্ত্বিকভাবে বৈধতা দেওয়া যায়। দেখা যাচ্ছে মার্কসবাদী ইতিহাসবিদদের পর্যবেক্ষণ বলছে বাবর একজন সংস্কৃতিবান, উদার এবং সাহসী শাসক, অথচ বাবরের আত্মজীবনীতেই হিন্দুদের প্রতি চরম ঘৃণা ও নৃশংসতার উল্লেখ রয়েছে। বামপন্থী ইতিহাসবিদদের মতে আকবর একজন মহান উদারপন্থী ও সমন্বয়কারী সংস্কৃতির প্রবর্তক। কিন্তু আকবরের চিতোর অভিযানের সময় হাজার হাজার সাধারণ হিন্দুর গণহত্যার ঘটনা কমিউনিস্ট ইতিহাসবিদদের সেই দাবি সমর্থন করে না। তারপর সেই বামপন্থী ইতিহাসবিদদের লেখাতেই ঔরঙ্গজেবকে দেখানো হয়েছে একজন পরিশ্রমী এবং আদর্শবাদী শাসক হিসেবে; ভারতের মাটিতে যার শত শত মন্দির ধ্বংস নাকি ছিল একটি রাজনৈতিক অবস্থান, আর কিছু নয়। অথচ বাস্তবে ঔরঙ্গজেবের জীবন— চরম মজহবি গোঁড়ামি, জিজিয়া কর পুনরায় আরোপ করা এবং ভারতের মন্দির ধ্বংসের নির্দেশ প্রদানের ঘটনায় ভরা।

আধুনিক যুগের ভারতে ব্রিটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসচর্চাতেও মার্কসবাদী ইতিহাসবিদরা মূলত ভারতীয় বামপন্থী আন্দোলনের চিন্তাধারার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। এই প্রক্রিয়ায় ভারতের সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ভূমিকাকে অত্যন্ত নেতিবাচকভাবে বা তুচ্ছ হিসেবে দেখানো হয়েছে। বিপান চন্দ্র তার 'ইন্ডিয়াজ স্ট্রাগল ফর ইন্ডিপেন্ডেন্স' গ্রন্থে বিপ্লবী ভগৎ সিং, চন্দ্রশেখর আজাদ এবং সূর্য সেনের মতো বিপ্লবীদের 'বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। যদিও পরবর্তীকালে ব্যাপক জনরোষের মুখে এই শব্দবন্ধ পরিবর্তন করা হয়, কিন্তু দশকের পর দশক ধরে শিক্ষার্থীদের শেখানো হয়েছে, এই বিপ্লবীরা বিপথগামী ছিলেন এবং তাদের গৃহীত পন্থায় দেশের মুক্তি সম্ভব ছিল না। বিপান চন্দ্রের মতে, শুধুমাত্র অহিংস গণ-আন্দোলনই ছিল বৈধ এবং কার্যকর।

এদিকে ভারতের কমিউনিস্ট দলগুলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানের সঙ্গে নেতাজির মিত্রতাকে 'ফ্যাসিবাদী জোট' হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। কমিউনিস্ট পার্টিগুলির এই রাজনৈতিক অবস্থানের প্রভাব ইতিহাস বইগুলোতেও দেখা যায়। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজের অবদানকে একদিকে যেমন পাঠ্যপুস্তকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত করে দেখানো হয়েছে, অপরদিকে তারা অহিংস আন্দোলনে নেহরু ও গান্ধীর একক কৃতিত্ব প্রমাণের চেষ্টা করেছেন, যাতে ব্রিটিশদের ভারত ছাড়ার প্রকৃত কারণ হিসেবে আইএনএ-র বিদ্রোহ এবং নৌ-বিদ্রোহের মতো ঘটনাগুলো আড়ালে পড়ে যায়।

মার্কসবাদী ইতিহাসবিদদের দ্বারা ইতিহাস

সাপ্তাহিক স্বস্তিকার মালিকানা সম্পর্কিত বিস্তৃত বিবরণ

১. **প্রকাশনের স্থান :** ২৭/১ বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬,
২. **প্রকাশনের সময় :** সাপ্তাহিক। ৩. **মুদ্রকের নাম :** শ্রী প্রশান্ত কুমার হাজরা। **নাগরিকত্ব :** ভারতীয়। **ঠিকানা :** ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৬।
৪. **প্রকাশকের নাম :** শ্রী সারদা প্রসাদ পাল। **নাগরিকত্ব :** ভারতীয়। **ঠিকানা :** ২০/৩, হালদার বাগান লেন, শ্যামবাজার, কলকাতা-৭০০০০৪।
৫. **সম্পাদকের নাম :** তিলক রঞ্জন বেরা। **নাগরিকত্ব :** ভারতীয়। **ঠিকানা :** নিউ টাউন, ইন্দা, খঙ্গপুর, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, ৭২১৩০৫।
মালিকানা : শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস্ ফাউন্ডেশন।
ঠিকানা : ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০০৬।
শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস্ ফাউন্ডেশন -এর ডাইরেক্টরবৃন্দ :
শ্রী সারদা প্রসাদ পাল, ২০/৩, হালদার বাগান লেন, শ্যামবাজার, কলকাতা-৭০০০০৪।
শ্রী তিলক রঞ্জন বেরা, নিউ টাউন, ইন্দা, খঙ্গপুর, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, ৭২১৩০৫।
শ্রী অজয় গোয়েল, লেক প্লাজা, ফ্ল্যাট - ৪এইচ, ৪র্থ তল, ২৭৭, যশোর রোড, তেঁতুলতলা, লেক টাউন, উত্তর ২৪ পরগণা, পিন কোড - ৭০০ ০৪৮
শ্রী অরিন্দম সিনহা রায়, বাউড়িয়া নর্থ মিল, চকমধু, রাধানগর, হাওড়া, পিন কোড- ৭১১৩১০

আমি শ্রী সারদা প্রসাদ পাল সজ্ঞানে ও বিশ্বাসমতে ঘোষণা করিতেছি যে, উল্লেখিত বিষয়গুলি সত্য।

প্রকাশকের স্বাক্ষর

শ্রী সারদা প্রসাদ পাল

তারিখ ঃ ০৬.০৪.২০২৬

শ্রী সারদা প্রসাদ পাল

বিকৃতির একটি বাস্তব ও নগ্ন উদাহরণ হলো ১৯৭৩ সালের 'টাইম ক্যাপসুল' বিতর্ক। ১৫ আগস্ট ১৯৭৩ তারিখে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী লালকেল্লার প্রাঙ্গণে একটি তামা ও ইস্পাতের ক্যাপসুল পুঁতে রাখেন, যার নাম দেওয়া হয়েছিল 'কালপাত্র'। এর উদ্দেশ্য ছিল ১০০০ বছর পরের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে ভারতের স্বাধীনতার প্রথম ২৫ বছরের ইতিহাস পৌঁছে দেওয়া। কিন্তু আইসিএইচআর-এর মাধ্যমে এই ইতিহাস রচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এস কৃষ্ণস্বামীর মতো মার্কসবাদী ইতিহাসবিদকে। ১৯৭৭ সালে জনতা পার্টি ক্ষমতায় আসার পর এই ক্যাপসুলটি খনন করে বের করা হয় এবং দেখা যায় সেখানে ইতিহাসের এক চরম নির্লজ্জ বিকৃতি ঘটানো হয়েছে। ১০,০০০ শব্দের সেই ইতিহাসে মহাত্মা গান্ধীর নাম পর্যন্ত ছিল না। এমনকী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, লালবাহাদুর শাস্ত্রী, রাজেন্দ্র প্রসাদ বা নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর কোনো উল্লেখ ছিল না। পুরো নথিটি ছিল নেহরু পরিবারের একপাক্ষিক গুণকীর্তন এবং কংগ্রেস সরকারের রাজনৈতিক প্রচারপত্র। এই ঘটনাটি প্রমাণ করে যে মার্কসবাদী ঐতিহাসিকরা কীভাবে তদানীন্তন কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ইতিহাসকে একদলীয় ইস্তেহারে পরিণত করেছিলেন।

বিকৃত ইতিহাসের পর্ব এখানেই শেষ নয়। ভারতের জাতীয় স্তরের পাঠ্যপুস্তকগুলোতে, বিশেষ করে এনসিইআরটি বইগুলোতে এক ধরনের দিল্লি-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করে যা মূলত মার্কসবাদী ইতিহাসবিদদের তৈরি করা। এর ফলে ভারতের বিশাল অংশের ইতিহাস, বিশেষ করে মধ্য, দক্ষিণ, উত্তর-পূর্ব এবং পশ্চিম ভারতের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস আড়ালে থেকে গেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, অসমের অহোম সাম্রাজ্য মুঘলদের ১৭ বার পরাজিত করা সত্ত্বেও তাঁদের বীরত্বগাথা ভারতীয় পাঠ্যপুস্তকে প্রায় অনুপস্থিত। লাচিত বরফুকনের মতো বীর যোদ্ধার নাম সাধারণ শিক্ষার্থীদের কাছে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা হয়েছে কারণ, তাঁর বীরত্ব মুঘলদের অপরাজিত থাকার মিথকে চুরমার করে দেয়। একইভাবে মারাঠা সাম্রাজ্য, যাঁরা মুঘলদের পতন ঘটিয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতের প্রধান শক্তিতে পরিণত হয়েছিল, তাদের ইতিহাসকে কেবল আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে উত্থান বা লুণ্ঠনকারী হিসেবে দেখিয়ে লঘু করা হয়েছে। ছত্রপতি শিবাজীকে একজন জাতীয় বীরের বদলে শুধু এক 'পাবর্ত্য মূষিক' বা জমিদার হিসেবে দেখানোর ঔপনিবেশিক প্রবণতাকে মার্কসবাদী ইতিহাসবিদরা বয়ে নিয়ে গিয়েছেন দশকের পর দশক। চোল, বিজয়নগর, চালুক্য বা রাষ্ট্রকূটদের মতো শক্তিশালী ভারতীয় রাজবংশগুলোর ইতিহাসকে এনসিইআরটি-র বইগুলোতে মুঘল বা দিল্লি সুলতানিদের তুলনায় অত্যন্ত সামান্য স্থান দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ ভারতের অসামান্য মন্দির স্থাপত্য এবং নৌ-শক্তির ইতিহাসকে সরিয়ে দিয়ে দিল্লির দরবারের কাহিনিকে প্রধান্য দেওয়া হয়েছে। সত্যিটা হলো এই যে, ভারতের হিন্দু রাজশক্তির গৌরবগাথা প্রচারিত হলে মার্কসবাদীদের তথাকথিত প্রগতিশীলতার বয়ান এবং শ্রেণী সংঘাতের তত্ত্ব ধোপে টেকে না। কমিউনিস্ট পার্টির অনুগত ইতিহাসবিদরা শুধুমাত্র দেশের ইতিহাসকে বিকৃত করেননি, তাঁরা কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিতর্কিত এবং দেশবিরোধী ভূমিকাগুলোকেও সুকৌশলে আড়াল করেছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন হিটলার সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করেন, তখন সোভিয়েত নির্দেশে ভারতের কমিউনিস্টরা ব্রিটিশদের সরাসরি সহায়তা করতে শুরু করে। সেই সময় তারা রীতিমতো ব্রিটিশ পুলিশের চরবৃত্তি করেছে এবং ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ধরিয়ে দিয়েছে। এই লজ্জাজনক অধ্যায়টিকে মার্কসবাদীদের রচিত ইতিহাসে 'ফ্যাসিবাদ-বিরোধী জনযুদ্ধ' হিসেবে মহিমান্বিত করা হয়েছে। ১৯৬২-র যুদ্ধের সময় কমিউনিস্টদের একটি বড়ো অংশ চীনের পক্ষ নিয়েছিল এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীকে আক্রমণকারী বলে দাগিয়ে দিয়েছিল। এই দেশদ্রোহী অবস্থানকে সমস্ত পাঠ্যপুস্তকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে, যাতে নতুন প্রজন্মের সামনে কমিউনিস্টদের ভাবমূর্তি নষ্ট না হয়। ১৯৪০-এর দশকে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি মুসলিম লিগের দ্বিজাতি তত্ত্ব এবং পাকিস্তান সৃষ্টির দাবিকে তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক সমর্থন দিয়েছিল। ইতিহাসের বইগুলোতে সাম্প্রদায়িক দেশভাগের দায় অন্যের ওপর চাপানো হলেও কমিউনিস্টদের এই লজ্জাজনক ভূমিকার কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অনুগত ইতিহাসবিদরা স্বাধীনতার পর কয়েক দশক ধরে প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে ইতিহাসের যে বিকৃত কাঠামো গড়ে তুলেছিলেন, তা আজ বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। সত্য গোপন, মিথ্যা তথ্যের উদ্ভাবন এবং আদর্শগত সেন্সরশিপের মাধ্যমে তারা ভারতের তরুণ প্রজন্মের মনে নিজ দেশের ঐতিহ্য সম্পর্কে হীনম্মন্যতা তৈরি করার চেষ্টা করেছেন। তারা ইতিহাসকে শুধুমাত্র রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন, যেখানে সত্যের চেয়ে রাজনৈতিক আনুগত্যই বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

তবে অরুণ শৌরি, সীতারাম গোয়েল, পিএন ওক, মীনাক্ষী জৈন এবং বিক্রম সম্পতের মতো আধুনিক গবেষকরা আজ বিভিন্ন ঐতিহাসিক নথিপত্র এবং তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে এইসব মিথ্যার প্রাসাদ ভেঙে দিচ্ছেন। ইতিহাসের এই 'ডিকলোনাইজেশন' বা ঔপনিবেশিক ও মার্কসবাদী প্রভাবমুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়া— ভারতের জাতীয় আত্মপরিচয় রক্ষার জন্য অত্যন্ত জরুরি। তাঁরা বলছেন ইতিহাস কোনো দলের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হতে পারে না। এটি একটি জাতির সামগ্রিক অভিজ্ঞতা ও অভিযাত্রার প্রতিফলন হওয়া উচিত। ভারতের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যাতে তাদের বীর পূর্বপুরুষদের অবদান, মধ্যযুগীয় সংঘর্ষ এবং প্রাচীন সভ্যতার প্রকৃত মর্যাদা জানতে পারে, সেজন্য এক নিরপেক্ষ ও প্রামাণ্য ইতিহাস রচনার প্রয়োজনীয়তা আজ অনস্বীকার্য। মার্কসবাদী ইতিহাসবিদদের রচিত বিকৃতির ইতিহাস থেকে বেরিয়ে এসে ভারতকে তার প্রকৃত সত্যের দর্পণে দেখা ও ইতিহাসের পুনর্লিখনই হবে আধুনিক ভারতচর্চার আসল সার্থকতা। □

শোক সংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সাংগঠনিক দক্ষিণ মুর্শিদাবাদ জেলার ধর্ম জাগরণ প্রমুখ অসিত ঘোষের মাতৃদেবী মহামায়া ঘোষ গত ১৪ মার্চ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৯ বছর। তিনি ১ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

পশ্চিমবঙ্গকে রক্ষা করতে আপনার মূল্যবান ভোট গুরুত্বপূর্ণ

আনন্দ মোহন দাস

পশ্চিমবঙ্গের ভোটদাতাদের সামনে এবারের বিধানসভা নির্বাচন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাদের একটি ভোটের উপর নির্ভর করবে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ভবিষ্যৎ। বর্তমান শাসকের ব্যাপক দুর্নীতি,আইনশৃঙ্খলার চরম অবনতি, শিল্পবন্ধ্যাত্ব, বেকারত্ব, পরিষেবাহীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, বেহাল শিক্ষা ব্যবস্থা ও নারীর নিরাপত্তাহীনতা ছাড়াও রাজ্যের ভোটারদের এবার কিছু মৌলিক বিষয়ের উপর ভিত্তি করে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে হবে। নইলে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির বাঙ্গালি হিন্দুর হোমল্যান্ড পশ্চিমবঙ্গ অচিরেই পশ্চিম বাংলাদেশে রূপান্তরিত হবে। ৩৪ বছরের বামফ্রন্টের অপশাসন এবং ১৫ বছরের নৈরাজ্যের তৃণমূলি শাসনে তোষণ রাজনীতির ফলে পশ্চিমবঙ্গ আজ অস্তিত্ব সংকটে। বর্তমানে রাজ্যের পরিস্থিতি ১৯৪৬ সালের কলকাতা ও নোয়াখালির ভীষণ হিন্দু নরসংহারের স্মৃতিকে উসকে দেয়। সম্প্রতি স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। সেজন্য সবকিছু বিচার করে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা একান্ত জরুরি।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ১৯৫১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে (অধুনা বাংলাদেশ) হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ২২ শতাংশ। আজ তা কমে দাঁড়িয়েছে ৮ শতাংশ। অন্যদিকে, সেই সময় পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান জনসংখ্যা ছিল ১৯.৮৫ শতাংশ, আজ তা বৃদ্ধি পেয়ে ৩০ শতাংশ হয়েছে। অথচ হিন্দু জনসংখ্যা ৭৮ শতাংশ থেকে কমে ৬৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। তাহলে কি পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশের পথে? এখানকার রাজ্যের আর্থিক বাজেটে বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে বরাদ্দ করা হয় মাত্র ৮২ কোটি টাকা কিন্তু মাদ্রাসা উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ হয় ৫৭০০ কোটি টাকা। তাহলে কি বিপুল পরিমাণ বরাদ্দে বাংলাদেশের মতো পশ্চিমবঙ্গেও মাদ্রাসায় ভরিয়ে দিয়ে মোল্লাতন্ত্রের পাঠ দেওয়া হবে? একসময় মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেছিলেন যে, সীমান্তবর্তী মাদ্রাসাগুলি সন্ত্রাসবাদীদের আঁতুড়ঘর।

এবারের নির্বাচন চাওয়া-পাওয়ার চেয়েও বাঙ্গালি হিন্দুর অস্তিত্বসংকট মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে। বঙ্গের ঐতিহ্য, পরম্পরা ও সংস্কৃতি আজ বিপদাপন্ন। শিক্ষাক্ষেত্রকে রাজনীতিকরণ ও দুর্নীতিগ্রস্ত করে কলুষিত করা হয়েছে। সেকুলারিজমের দোহাই দিয়ে সর্বস্তরে সিলেবাসে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ হয়েছে। বাংলাভাষার মধ্যে উর্দু, আরবি, ফার্সির মিশ্রণ ঘটিয়ে বাংলাভাষার অবনমন ঘটানো হয়েছে। তাই শিক্ষাব্যবস্থাকে রাজনীতি ও দুর্নীতিমুক্ত করতে হলে সুচিন্তিতভাবে ভোটদান করা জরুরি।

যতদিন হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকবে, ততদিন এরাজ্যে গণতন্ত্র ও সেকুলারিজম বজায় থাকবে। তা নাহলে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মতো হবে।

এছাড়া, বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের দাপটে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার ভারসাম্যহীনতা হিন্দুদের জীবন জীবিকাকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। পশ্চিমবঙ্গ এখন বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের স্বর্গরাজ্য। রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশি জেহাদি মুসলমানদের তাণ্ডবে হিন্দুরা কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। তাদের জীবন-জীবিকা, বাসস্থান, ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সংস্কৃতি বিপদের মুখে। জেহাদি ও দেশবিরোধী শক্তির রমরমা বেড়েছে। এই রাজ্যে বাংলাদেশি ও পাকিস্তানি জঙ্গিরা নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে এই পশ্চিমবঙ্গকেই সেফ করিডোর হিসেবে বেছে নিয়েছে। এখানেই সন্দেশখালি,সামশেরগঞ্জ ও অভয়াকাণ্ডের মতো ঘটনা ঘটেছে। সম্প্রতি বাংলাদেশের নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত সংলগ্ন জেলাগুলিতে জেহাদি জামাতিরা অধিকাংশ আসনে জয়লাভ করেছে। এরা এই অঞ্চলের জেলাগুলিতে ইতিমধ্যে নিজেদের নেটওয়ার্ক তৈরি করে ফেলেছে। এর ফলে সীমান্তের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা প্রশ্নের মুখে পড়েছে। এই সমস্ত মুসলমান অধ্যুষিত জেলাগুলিতে ইতিমধ্যে হিন্দুদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত। তাই শাসকদলের মদতে জেহাদিদের দ্বারা সিএএ,এনআরসি ও ওয়াকফ বিলের প্রতিবাদের নামে চারদিকে হিংসাত্মক আন্দোলন, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ এবং চন্দন দাস ও হরগোবিন্দ দাসের মতো

ফঃ ২

হিন্দুকে নৃশংসভাবে কুপিয়ে ও জীবন্ত অবস্থায় অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে।

এই সমস্ত অঞ্চলে সন্ত্রাসের মাধ্যমে নিরীহ হিন্দুদের আতঙ্কিত ও হয়রানি করা নিত্যদিনের ঘটনা। আন্দোলনের নামে জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ করে জনজীবন বিপর্যস্ত করা হয়েছে। বর্তমানে এই সমস্ত অঞ্চলে অস্বাভাবিকভাবে বাংলাদেশি মুসলমানদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির জাতীয় হারের চেয়ে এই রাজ্যে বিশেষ করে সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনেক বেশি। এছাড়া স্থানীয় শাসকদলের মদতে বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারীরা রেশনকার্ড,আধার কার্ড, পাসপোর্ট, প্যান কার্ড ও ভোটার কার্ড বানিয়ে সমস্ত সরকারি সুবিধা ও আর্থিক ভরতুকির সুযোগ পাচ্ছে। সিপিএম, কংগ্রেস ও তৃণমূলের ভোটব্যাংকের রাজনীতির ফলে দেশের সুরক্ষা, নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব বিঘ্নিত হওয়ার পথে। অন্যান্য রাজ্যে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা গ্রেপ্তার হলে তাদের আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, রেশন কার্ড বা পাসপোর্ট এই রাজ্যেই তৈরি হয়েছে বলে জানা যায়। এরাজ্যে এই সমস্ত পরিচয় পত্রগুলি শাসকদলের মদতে অনায়াসেই বেআইনিভাবে একটি আর্থিক প্যাকেজের মাধ্যমে বানিয়ে দেওয়ার প্রচলন রয়েছে। এটি যেকোনো দেশের সুরক্ষার ক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর বিপদ। এছাড়াও রাজ্য সরকারের উপর বেআইনি আর্থিক বোঝা বৃদ্ধি পাবে। রাজ্যের মাথা পিছু খরচ বৃদ্ধি পাবে এবং রাজস্বের উপর চাপ পড়বে।

এই ধরনের বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের পিছনে সরকারি অর্থ ব্যয় হলে রাজ্যের প্রকৃত নাগরিকরা তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হবেন। ভোটের লোভে সরকারি অর্থে বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয় দেওয়া দেশদ্রোহিতার শামিল। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সরকার এই জ্বরে আক্রান্ত। তাইতো শুদ্ধ ভোটার তালিকা নির্মাণে এসআইআর

হলে তার এতো বিরোধিতা। ১২টি রাজ্যে নির্বিঘ্নে এসআইআর সম্পন্ন হলেও শাসকের বিরোধিতায় পশ্চিমবঙ্গে আজও প্রক্রিয়া অসম্পূর্ণ রয়েছে এবং অভূতপূর্ব নজির গড়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে বিচারকদের উপর দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে। রাজনৈতিক কারণে পশ্চিমবঙ্গ আজ আঞ্চলিকতার বিষবাষ্পে জড়িয়ে গেছে। এখানে বাঙ্গালি অস্মিতার নামে বাঙ্গালি-অবাঙ্গালি আওয়াজ তুলে সামাজিক বিভাজনের চেষ্টা চলছে। বাঙ্গালি-অবাঙ্গালি নির্বিশেষে সবাই যে ভারতীয় এই বোধকে ভুলিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত চলেছে। বাংলাদেশের স্লোগান 'জয় বাংলা' এখন এরাজ্যের শাসকদলের স্লোগান হয়েছে। এরা ভোটের লোভে মুসলমান তুষ্টীকরণে পূর্ণাঙ্গ 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতের বিরোধিতা করেছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর নামে কেন্দ্রীয় সরকারের সব সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছে বা বাধাদানের চেষ্টা করেছে। এরা সংবিধান ও বিচার ব্যবস্থার বিরোধিতা করতেও ছাড়ে না। সর্বদা কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে নিজেদের পৃথক রাখার বাসনা জাতীয় সংহতির পক্ষে বিপজ্জনক। বিগত ৪৯ বছরে বামফ্রন্ট ও তৃণমূল সরকার একই ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এই ধরনের নেতিবাচক রাজনীতি দেখে দেখে ক্লান্ত। রাজ্যের প্রকৃত উন্নয়নে এর পরিবর্তন খুব জরুরি। নইলে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে রাজ্য আরও পিছিয়ে যাবে।

জনবিন্যাসের পরিবর্তনের ফলে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা খারাপ হয়েছে। রাজ্যে আইনের শাসন চাই, শাসকের আইন নয়। দোষীর ধর্ম বা রাজনৈতিক পরিচয় না দেখে,অপরাধই একমাত্র বিচার্য বিষয় হওয়া উচিত। লাগামছাড়া তাণ্ডবে মালদহে শাসকদলের মুসলমান ছাত্র নেতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি পুড়িয়ে উল্লাস করলেও শাস্তি হয় না। মুসলান জেহাদিরা ধুলিয়ান, সামশেরগঞ্জে জাতীয় সড়ক ২৪ ঘণ্টা অবরোধ করলেও প্রশাসন ব্যবস্থা নেয় না। এই সমস্ত ঘটনাবলী কিছু দিন আগের বাংলাদেশের চিত্র মনে করে দিচ্ছে না কি? সেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যজিৎ রায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও অন্যান্য হিন্দু মনীষীদের ছবি পোড়ানো বা বাসস্থান ধ্বংস করার মতো ঘটনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে না কি? এগুলি আগামী দিনের অশনি সংকেত নয় কি? বাংলাদেশের মতো এখানেও অনেক স্থানে দুর্গাপূজা, সরস্বতী পূজা, নামসংকীর্তনে বাধা দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। অন্যান্য হিন্দু ধর্মীয় রীতিনীতি পালনে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে দেবদেবীর মূর্তি ভাঙা, তুলসী মঞ্চ ভাঙা ও হিন্দু মন্দির অপবিত্র করা ইত্যাদি এখন নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজ্য সরকারের অসহযোগিতায় জমির অভাবে ৫৪৪ কিলোমিটার সীমান্ত অসুরক্ষিত থাকায় অপরাধমূলক কাজ করে বাংলাদেশে পালিয়ে যাওয়া অপরাধীদের রোজকার ঘটনা। সেজন্য কেন্দ্রের সঙ্গে সমন্বয়কারী রাজ্য সরকার দরকার। তাই এই নৈরাজ্যের শাসনের পরিবর্তন খুবই জরুরি। যতদিন হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকবে, ততদিন এরাজ্যে গণতন্ত্র ও সেকুলারিজম বজায় থাকবে। তা নাহলে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মতো হবে। এসব বিষয় মাথায় রেখে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ভোটদান করা প্রতিটি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকের একান্ত কর্তব্য।

অরাজকতার অবসানে পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তন প্রয়োজন

প্রণবজ্যোতি ভট্টাচার্য

দুয়ারে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্বাচন। রাজ্যজুড়ে উঠেছে আরও একবার পরিবর্তনের ডাক। এর আগে একবার পরিবর্তন হয়েছিল বছর পনেরো আগে। সেবার তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে সাড়া দিয়ে বঙ্গবাসী রাজ্য থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন ৩৪ বছর ধরে শাসন করে যাওয়া বামফ্রন্ট নামক জগদ্দল পাথরটাকে। বাম জমানায় নাভিশ্বাস ওঠা বাঙ্গালি একটু অক্সিজেন নিয়ে বামেদের হটিয়ে বেছে নিয়েছিল তৃণমূলকে। তার জেরেই ২০১১ সালে বঙ্গবাসী সাক্ষী হন রাজনৈতিক পালাবদলের। সেবার বিধানসভা নির্বাচনে আক্ষরিক অর্থেই ধরাশায়ী হয় বামেরা। রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় আসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন সরকার। প্রথম প্রথম একটা-দুটো বছর তৃণমূল সরকার মানুষের বিশ্বাস অর্জন করেছিল। পশ্চিমবঙ্গবাসী ভেবেছিল 'বসন্ত এসে গেছে'। কিন্তু ও হরি! কোথায় 'বসন্ত', কোথায় কী! বামেদের ক্ষমতাচ্যুত করে যারা ক্ষমতার আসনে বসেছে, তারাও তো সেই রাবণ হয়ে উঠেছে দিন দিন। বামেদের ছত্রছায়া থেকে বেরিয়ে হাঁসফাঁস করে ওঠা বাঙ্গালি যে অক্সিজেন চেয়ে ক্ষমতায় নিয়ে এসেছিল তৃণমূলকে, তারাই দুর্নীতির পর দুর্নীতিতে জেরবার করে দিল রাজ্যবাসীর জীবন। জীবনে প্রথমবার ক্ষমতার স্বাদ পাওয়া তৃণমূল রাজ্যটিকে পৈতৃক সম্পত্তি মনে করতে লাগল। শুরু হয়ে গেল লুটেপুটে খাওয়ার রাজনীতি। দুর্নীতির পাঁকে এক এক করে ডুবতে লাগলেন মুখ্যমন্ত্রী এবং তার দলের কেষ্টবিষ্টুরা। এদের ব্যবসার ধরনও আলাদা। কারও বিরুদ্ধে উঠল গোরু পাচারের অভিযোগ, কেউ করলেন চিটফান্ড লুঠ, কেউ করলেন বালি ও কয়লা পাচার, কেউ আবার নেমে পড়লেন চুরি করে চাকরি বিক্রিতে, রেশনে সাধারণ মানুষের জন্য কেন্দ্রের দেওয়া চাল-গম-আটা খেয়ে জেলের ঘানিও টানলেন তৃণমূলের আদি এবং অকৃত্রিম নেতা। শুধু কি তাই? 'করেকম্মে' খাওয়ার রাজনীতির ঘূর্ণিপাকে জড়িয়ে গিয়ে রসে-বশেও থাকতে শুরু করলেন তৃণমূলের একাধিক নেতা। এদের কেউ হাঁটুর বয়সি তরুণীদের নিয়ে ফুর্তি করে, 'ওহ, লাভলি' গেয়ে এবং সেই দৃশ্য ভাইরাল করে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে শুরু করলেন সস্তার রাজনীতি। তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রীর বান্ধবীর বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা, সোনাদানা, গহনা। এই টাকা গুনতে বেশ কয়েকটা মেশিনও আনতে হয়েছিল।

এ তো গেল তৃণমূলের '২ নম্বর' নেতাদের কাজ-কারবার। এই দলেরই উত্তরাধিকার যার হাতে, তারও নাকি পোয়াবারো অবস্থা। একাধিক কেলেঙ্কারিতে নাম জড়িয়েছে তার। কালীঘাটের হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে তার বাড়িটা (পড়ুন, প্রাসাদ) হাঁ করে তাকিয়ে দেখতে হয়। না, তিনি কোনও বড়ো চাকরি করেন না। মন্ত্রী পদেও ছিলেন না। তবে লোকসভার সাংসদ রয়েছেন, আর রয়েছে তার গায়ে লেগে থাকা মা-মাটি-মানুষের বোঁটকা গন্ধ! এই মা-মাটি-মানুষের রাজনীতি করতে গিয়েই কপাল খুলেছে তার। যে বাড়িতে তৃণমূলের এই সেকেন্ড ম্যান থাকেন, সেখানে বাড়ির একতলা থেকে অন্য তলায় যেতে গেলে চড়তে হয় এসক্যালেটরে। সাধারণ বাঙ্গালি এসক্যালেটর দেখতে পেয়েছিল মেট্রোরেল চালু হওয়ার দৌলতে, তবে কোন বাড়িতে এসক্যালেটর! না এমনতর বাড়ি তো এই রাজ্যে আর দু'টি আছে কিনা, সন্দেহ।

'ভাইপো' যখন এসক্যালেটরে চড়ে ভোঁ করে চলে যান বাড়ির একতলা থেকে অন্য তলায়, তখন অদূরেই ঠাই দাঁড়িয়ে থাকে 'পিসিমা'-র সাধের টালির চালের ঘরটা। সে ঘরে দিব্যি রয়েছে আধুনিক জীবনযাপনের সমস্ত সাজসরঞ্জাম। তবে কোনও এক অজ্ঞাত কারণে ছাদ ঢালাই হয়নি সেই বাড়ির। অথচ, তাঁর যে পয়সা নেই, তা নয়। তিনি তৃণমূলের সর্বময় কর্ত্রী। লোকসভার সাংসদ ছিলেন, হয়েছিলেন মন্ত্রীও, পরে হাল ধরেছেন রাজ্যের। আক্ষরিক অর্থেই তাঁর একই অঙ্গে বহু রূপ। কখনও তিনি আবির্ভূত হন লড়াকু নেত্রী হিসেবে, কখনও আবার চিত্রশিল্পী হিসেবে, কবি-লেখক হিসেবেও তাঁর বিশেষ খ্যাতি (অখ্যাতি!) রয়েছে। সর্বদাই স্তাবক-পরিবৃত দলনেত্রীর আঁকা ছবি একটা সময় বিক্রি হয়েছে কোটি টাকায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত চিটফান্ডকান্ডে নাম জড়িয়ে যাওয়ায় জেলে পচছেন তার ছবির 'সমঝদার'রা। ছবির ক্রেতারা জেলে থাকায়, নেত্রীর ছবিও আর বিক্রি হয় কই? এই তো সেদিন, এসআইআরে কয়েক লক্ষ ভোটারের

> বিজেপি ক্ষমতায় এলেই যে রাতারাতি এ রাজ্যে সোনা ফলবে, তা নয়। কারণ শুধু তৃণমূলের জমানাতেই রাজ্যবাসীর ঘাড়ে চেপেছে হাজার হাজার কোটি টাকার ঋণের বোঝা। অথচ, কেন্দ্রের দেওয়া টাকা কখনও খরচ না হওয়ায় ফেরত পাঠাতে হয়েছে দিল্লিতে, কখনও আবার কেন্দ্র সরকারের উন্নয়নমূলক খাতে দেওয়া টাকায় করা হয়েছে দান খয়রাতি।

নাম 'বিবেচনাধীনে'র তালিকায় চলে যাওয়ার পরেই শুরু হয়েছিল এক দফা 'নাটক'। অনশনে বসা নেত্রীর সময় কাটে কীভাবে? অগত্যা তিনি মঞ্চে বসেই মন দিলেন শিল্পকর্মে। ইজেল-ক্যানভাস-রং-তুলিতে আঁকা হয়ে গেল 'হিজিবিজি' সব ছবি ।

শিল্পী সত্তা বাদ দিলে তৃণমূলেশ্বরীর ঘাসফুল আঁকা ঝুলিতে থাকে হরেক কিসিমের বই। এ সবেরই লেখিকা তিনি। তাঁর লেখা সেই সব বই আবার পড়ানোও হয় স্কুলে স্কুলে। তাঁর দাবি, বই বিক্রির আয়েই সংসার চলে যায় তাঁর। তাঁর লেখক সত্তাকে কুর্নিশ জানিয়েছেন স্তাবক-লেখকের দল। তাদের বক্তব্যের নির্যাস, রবীন্দ্রনাথের পরেই যার ঠাঁই হতে পারে, তিনি লেখিকা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়!

তাঁর লড়াকু ভাবমূর্তির কথা কেই-বা না জানে! তাঁরই আন্দোলনের জেরে সিঙ্গুর থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে গুজরাটে চলে যেতে হয় টাটাদের। তাঁরই 'পরিকল্পনাহীন' আন্দোলনের বলি হতে হয় মহাকরণ অভিযানে যাওয়া ১৩ জন তরতাজা মানুষকে (অবশ্য তখন তিনি ছিলেন কংগ্রেসে, আন্দোলন হয়েছিল যুব কংগ্রেসের ব্যানারে, মহাকরণে ছিল বামেদের সরকার)। এহেন লড়াকু এক নেত্রী নিজেকে সব সময় দাবি করেন 'মিসেস ক্লিন' হিসেবে। তিনি যাপন করেন নিতান্তই সাদামাটা জীবন। তাঁর টালির চালের ঘরটিতে রয়েছে আধুনিক জীবনযাপনের সমস্ত সুযোগসুবিধা। তিনি নিজে সৎ জীবন যাপন করেন বলে দাবি করেন। অথচ, কুর্সি বাঁচাতে সেই তিনিই আবার একের পর এক দুর্নীতিতে নাম জড়ানো নেতাদের পাশে দাঁড়িয়ে বিজেপির বাপান্ত করে বাইট দেন সংবাদমাধ্যমে। তার এই রণংদেহি মূর্তির ছবি ফার্স্টপেজে ছাপে বিজ্ঞাপন-লোভী দৈনিকের খবরওয়ালারা। বস্তুত, তাঁরই দয়ায় 'করে খাচ্ছেন' এ রাজ্যের একটা অংশ। তাঁরই নামের 'গুণে' কয়েক কোটি টাকা দিয়ে বাড়ি বানান ক্লাস সেভেন পাশ শাসক দলের এক নেতা। নেত্রীর নাম শুনলেই থরহরিকম্প পুলিশের বড়ো বড়ো কর্তাদেরও। তাই, রামনাম নয়, তারা ভজতে থাকেন মমতা-নাম। এই নাম মাহাত্ম্যেই এ

কখনও ছাপ্পা ভোট দিয়ে, কখনও আবার বামেদের কায়দায় ভয় দেখিয়ে কিংবা ইভিএমে কারসাজি করে ভোট লুটে বছরের পর বছর আঁকড়ে ধরে থেকেছেন নবান্নের চোদ্দতলার চেয়ারটা।

রাজ্যে যা-খুশি তাই করে পার পেয়ে যান তৃণমূলের ছোটো-বড়ো-মেজো নেতারা। তাঁর দয়ায় কেউ না পড়লেও এবং লাইব্রেরিয়ান না থাকা সত্ত্বেও, বছর বছর বইমেলা থেকে বই কিনতে হুমড়ি খেয়ে পড়েন গ্রাম থেকে শহরের লাইব্রেরিগুলির কর্তাব্যক্তিরা। সরকারি পয়সার আদ্যশ্রাদ্ধ করে তারা ঢাউস 'এক ব্যাগ মমতা' কিনে মনের আনন্দে বাড়ি ফেরেন। ভালো বই পড়ার নেশায় যেসব বইপ্রেমী মানুষ এখনও (অবশ্য হাতে গোনা) এই সব লাইব্রেরিতে যান, সেখানে এক ব্যাগ শঙ্করের মতো থাকে থাকে সাজানো তৃণমূল নেত্রীর বই দেখে হতাশ হয়ে খালি হাতে তারা বাড়ি ফেরেন।

এহেন সর্বগুণে গুণান্বিতা নেত্রী আবার একবার চলে এসেছেন খবরের শিরোনামে। কারণ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন। ছাব্বিশ-হাজার চাকরি খাওয়া দলের নেত্রী ভোট চাইতে বেরিয়ে পড়েন ভোটারদের দুয়ারে দুয়ারে। তুষ্টীকরণের রাজনীতি করে 'বেওসা' চালিয়ে যাওয়া এই নেত্রীই দাবার বোড়ে করেন মুসলমানদের। তার জেরেই প্রতিবার রক্তাক্ত হয় ভারতীয় গণতন্ত্রের এই মহান উৎসব। কখনও ছাপ্পা ভোট দিয়ে, কখনও আবার বামেদের কায়দায় ভয় দেখিয়ে কিংবা ইভিএমে কারসাজি করে ভোট লুটে বছরের পর বছর আঁকড়ে ধরে থাকেন নবান্নের চোদ্দতলার চেয়ারটা।

এই চেয়ার থেকেই তাঁকে সরাতে উঠেপড়ে লেগেছে রাজ্যের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষরা, অবশ্যই বিরোধী দল বিজেপি-র ছত্রছায়ায়। সুশাসন এবং জনকল্যাণের সংকল্পপত্র নিয়ে ভোট প্রচার করে চলেছেন গৈরিক সৈনিকরা। বেকারদের কর্মসংস্থান, রাজ্যে শিল্প গড়ার পরিকাঠামো তৈরি এবং রাজ্যের তরুণরা যাতে রাজ্যেই কাজ পান এবং সম্মানের সঙ্গে বাঁচতে পারেন, তারও আশ্বাস দিয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি। যাঁরা সরকারি চাকরি করছেন, কিংবা পেনশন হোল্ডার, তাদের জন্য সপ্তম পে-কমিশনের প্রস্তাবিত হারে বেতন দেওয়ার আশ্বাসও দিয়েছে নরেন্দ্র মোদী-অমিত শা-নীতীন নবীনের দল।

বিজেপি ক্ষমতায় এলেই যে রাতারাতি এ রাজ্যে সোনা ফলবে, তা নয়। কারণ শুধু তৃণমূলের জমানাতেই রাজ্যবাসীর ঘাড়ে চেপেছে হাজার হাজার কোটি টাকার ঋণের বোঝা। অথচ, কেন্দ্রের দেওয়া টাকা কখনও খরচ না হওয়ায় ফেরত পাঠাতে হয়েছে দিল্লিতে, কখনও আবার কেন্দ্র সরকারের উন্নয়নমূলক খাতে দেওয়া টাকায় করা হয়েছে দান খয়রাতি। একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্পের নাম বদলে রাজ্যের প্রকল্প বলে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। ক্ষমতায় টিকে থাকতে একের পর এক ভাতা দিয়ে 'ভোট কিনে' চলেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। তার জেরে বছরের পর বছর ক্ষমতায় টিকে রয়েছেন নেত্রী। রাজনৈতিক মহলের মতে, এবার এই ভোট কেনায় বাধ সাধতে পারে নির্বাচন কমিশন। রাষ্ট্রভক্ত মুসলমানরাও ঘাসফুলের পাশ থেকে সরে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন পদ্মফুলের ছত্রছায়ায়। তাই ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচন তৃণমূলের কাছে নিছক কেক-ওয়াক হবে না, বরং, বলা যেতে পারে, তৃণমূলের অগ্নিপরীক্ষা কিংবা আরও সহজ করে বললে কাঁটার মুকুট পরে ভোট-বৈতরণী পার হওয়া। তবে তাতে তৃণমূলনেত্রী সফল হবেন কিনা, তা বলবে সময়।

যদিও ইতিমধ্যেই কারণ দেখিয়ে স্লোগান তৈরি করে ফেলেছেন পদ্ম শিবিরের ভোট ম্যানেজাররা। তাঁরা আওয়াজ তুলেছেন, 'পালটানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার।' রাজ্যের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষরাও শামিল হয়েছেন বিজেপির সঙ্গে এই নৈরাজ্যের অবসান ঘটাতে। □

শেষ সুযোগ ২০২৬

পরিবর্তন না এলে কী অপেক্ষা করছে পশ্চিমবঙ্গের জন্য ?

সাধন কুমার পাল

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট বাংলাধেশের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিতাড়নের পর, বাংলাদেশে ভারত-বিরোধী জিগির উঠলেও এবং এবারের ভোটে ভারত-বিদ্বেষী জামাতে ইসলামি ও ছাত্র জোট ক্ষমতা দখল করতে না পারলেও পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত বরাবর বাংলাদেশের বেশিরভাগ অংশেই জয়ী হয়েছে ভারতবিদ্বেষী জামাত। পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত বরাবর--- সাতক্ষীরা, খুলনা, যশোর, ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙা, মেহেরপুর, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, জয়পুরহাটের মতো জায়গায় নির্বাচনে জিতেছে জামাত। বাংলাদেশের এই জেলাগুলির গা ঘেঁষেই রয়েছে মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগনার মতো জেলা। যা ভারতের জন্য সত্যিই উদ্বেগের।

জামাতের জন্ম ১৯৪১ সালে অবিভক্ত ভারতে। পাকিস্তান ভাগ হয়ে বাংলাদেশের জন্মের সময় 'রাজাকার' নামে পরিচিত এই জামাতিরা পাকিস্তানের খান সেনাদের সঙেঝ হাতে হাত মিলিয়ে এক ভয়ঙ্কর গণহত্যার ইতিহাস তৈরি করেছিল। বিগত ৭৭ বছরের ইতিহাসে বাংলাদেশের মাটিতে জামাতের এত বড়ো উত্থান হয়নি। ২০২৬-এর নির্বাচনে তারা ৩২ পার্সেন্ট ভোট পেয়ে মোট ৭৭ টি আসন দখল করে এক ভয়ঙ্কর উত্থানের ইতিহাস তৈরি করেছে। ওদের লক্ষ্য ভারতবর্ষকে ইসলামিক দেশে পরিণত করা।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ, অসম ও ত্রিপুরার সীমান্ত এলাকায়, গত কয়েক দশকে উল্লেখযোগ্য জনবিন্যাসগত বা ডেমোগ্রাফিক পরিবর্তন ঘটেছে। মূলত বাংলাদেশ থেকে অব্যাহত অবৈধ অভিবাসন এবং সীমান্তবর্তী এলাকায় উচ্চ জন্মহারের কারণে এই অঞ্চলগুলোতে স্থানীয় জনসংখ্যার অনুপাত এবং ধর্মীয় বিন্যাসে বড়ো পরিবর্তন এসেছে।

Sarbananda Sonowal vs Union of India (২০০৫) মামলায় সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল—

বাংলাদেশ থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশের কারণে সীমান্তবর্তী জেলাগুলোর জনসংখ্যাগত গঠন পরিবর্তিত হয়েছে। সীমান্তবর্তী জেলা গুলোতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার জাতীয় গড়ের চেয়ে বেশি ।

২০১১ সালের জনগণনার তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে—

পশ্চিমবঙ্গ ও অসমের কিছু সীমান্ত জেলায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি অস্বাভাবিকভাবে বেশি।

২০২৬ সালের ইন্টেলিজেন্স/ সিকিউরিটি রিপোর্ট অনুযায়ী—

সীমান্ত এলাকায় নতুন করে অবৈধ অনুপ্রবেশের চেষ্টা চলছে বড়ো পরিসরে জনবিন্যাস পরিবর্তনের আশঙ্কা নিয়ে নজরদারি চলছে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে জামায়াতে ইসলামি কীভাবে সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে বিজয়ী হয়েছে , সেটা একটা প্রসঙ্গ। সেই আলোচনায় না গিয়েও বলা যায় যে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে জামায়াতের এই ফলাফলের মারাত্মক প্রভাব পড়তে বাধ্য। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বেড়া না দেওয়া অনেকটা জায়গা পড়ে রয়েছে। এর অধিকাংশটাই পশ্চিমবঙ্গের। এরাজ্যের অনেকটা অংশেই এখনও কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া যায়নি। এর একটা বড়ো কারণ রাজ্য সরকারের জমি দিতে অনীহা। বাম জামানা থেকে শুরু করে তৃণমূল জামানা পর্যন্ত এ রাজ্যের কোনো শাসক চায়নি যে সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হোক, না হলে তো অনুপ্রবেশ চলতে থাকবে কী করে? রাজ্যের শাসক দল তো চায় যে অনুপ্রবেশ হোক, সীমান্তের জেলাগুলিতে জনবিন্যাস বদলে যাক। অনুপ্রবেশকারীদের নাম ভোটার তালিকায় উঠুক এবং তাদের ভোটব্যাংকও ফুলেফেঁপে উঠুক। পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর শুরু হওয়ার পর মিডিয়ার দৌলতে সারা পৃথিবী দেখেছে যে বাংলাদেশি মুসলমানরা দলবেঁধে সীমান্ত পার হয়ে বাংলাদেশে ফিরে যাচ্ছে। এদেরকে রক্ষা করার জন্য এসআইআর-এর বিরোধিতা করে মরণপণ লড়াই করছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী। সশরীরে সুপ্রিম কোর্টে পর্যন্ত তিনি ছুটে গিয়েছেন। এক শ্রেণীর পেটোয়া রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের দিয়ে বিশৃঙ্খলা তৈরি করে রাজ্য জুড়ে অরাজকতা তৈরির চেষ্টা করেছেন। একদিকে জামাত অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছে, অন্যদিকে সেই অনুপ্রবেশকারীদের ভোটে ক্ষমতায় টিকে থাকতে এ রাজ্যে অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয় দেওয়ার বেপরোয়া প্রয়াস চালাচ্ছেন তৃণমূলনেত্রী। অর্থাৎ জামাতের ভারত দখলের ছকের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতায় টিকে থাকার ছক পরিপূরক হিসেবে কাজ করছে।

পশ্চিমবঙ্গের বাংলাদেশ সীমান্তে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাতে হিন্দুরা

ভোট দিতে পারে না। নির্বাচনের দিন সীমান্ত পার হয়ে বাংলাদেশি মুসলমানরা ভোট দিয়ে যায়। স্থানীয়দের থেকে সংগৃহীত তথ্য অনুসারে, ২০২১-এর পোস্ট পোল ভায়োলেন্সের সময় সীমান্ত পার হয়ে এসে বাংলাদেশি মুসলমানরা হিন্দুদের উপর নারকীয় অত্যাচার চালিয়েছে। পুলিশ প্রশাসনের হাত-পা বাঁধা, সব দেখে বুঝেও হাত গুটিয়ে বসে থাকা ছাড়া ওদের কোনো উপায় নেই। বাংলাদেশের জামাত এবং তৃণমূল কংগ্রেসের এই ভয়ঙ্কর রাজনীতির 'একই অভিমুখ' আজকের পশ্চিমবঙ্গেও ভয়ংকর বাস্তব। পশ্চিমবঙ্গে জেহাদি জামাতিদের শক্তি সম্পর্কে খোদ মুখ্যমন্ত্রী যে ওয়াকিবহাল তা তাঁর কথাতেই স্পষ্ট। কিছুদিন আগে এসআইআর-এর বিরোধিতা করে ধর্মতলার ধরনা মঞ্চ থেকে তিনি বলেছিলেন, 'আমরা আছি বলে আপনারা সবাই ভালো আছেন। যদি আমরা না থাকি, যদি তেমন দিন আসে তাহলে এক সেকেন্ড লাগবে। একটা কমিউনিটি যখন জোট বেঁধে ঘিরে ফেললে এক সেকেন্ডে দেবে একদম ১২টা বাজিয়ে। যদি নিজেদের ১৩টা বাজাতে না চান তাহলে বিজেপির অপপ্রচারে কেউ কোনোদিন ভুল বুঝবেন না।' এভাবেই পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের সরাসরি হুমকি দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসে থাকা তৃণমূলনেত্রী। সৃষ্টি করছেন সন্ত্রাসের বাতাবরণ। এই হুমকি বিশ্লেষণ করলে ১৯৪৬ সালের কলকাতার হিন্দু নরসংহারের প্রেক্ষাপট পুনরাবৃত্তির ছবিটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেসময় ক্ষমতাসীন সুরাবর্দি পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করে রেখেছিলেন। সেই সুরাবর্দির মতো তৃণমূলনেত্রীও সেই কথাই বলছেন উনি চাইলে পুলিশ নিষ্ক্রিয় থাকবে আর জামাতিরা তাদের মতো করে রক্তের বন্যা বইয়ে দেবে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে। এর আগে যখন তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবির বলেছিলেন হিন্দুরা এখানে ৩০ শতাংশ, আমরা ৭০ শতাংশ, যখন চাইবো কেটে ভাগীরথীর জলে ভাসিয়ে দেব, তখন মুখ্যমন্ত্রী চুপ ছিলেন? যেদিন ফিরহাদ হাকিম বলেছিলেন, প্রত্যেক মুসলমানের উচিত আরও একজনকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করা, সেদিনও মুখ্যমন্ত্রী চুপ ছিলেন ।

এবার রেড রোডে ইদের নামাজে গিয়ে মমতা ব্যানার্জি হিন্দিতে দেওয়া ৬-৭ মিনিটের বক্তব্যে বড়োজোর এক মিনিট শুভেচ্ছা বার্তা দিয়েছেন বাকি সময় এসআইআর বিরোধিতা, বিজেপি বিরোধিতা-সহ প্রধানমন্ত্রীকে গালিগালাজ করেছেন। বাংলাদেশের জামাতিরা যে ভাষায় ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে গাল দেয়, ঠিক একই ভাষায় প্রধানমন্ত্রীকে দেশের সবচেয়ে বড়ো অনুপ্রবেশকারী বলে গাল দিয়ে হাততালি কুড়িয়েছেন তৃণমূলনেত্রী। দেশের প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে কুৎসিত ভাষায় আক্রমণ করা এবং সেই সঙ্গে দেশের রাষ্ট্রপতিকে অপমান করা মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিদিনের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। সেই জামাতি জেহাদিদের মনোরঞ্জনের জন্য নিরন্তর উনি ভারতের সাংবিধানিক ব্যবস্থাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে যাচ্ছেন। বাংলাদেশে যেমন পাকিস্তানপন্থী রাজাকারদের হাতে নিরন্তর হিন্দুরা আক্রান্ত হচ্ছে, ঠিক তেমনি পশ্চিমবঙ্গেও 'বাংলার রক্ষাকর্ত্রী'র ছদ্মবেশ ধারণ করে বাঙ্গালি চেতনাকে নিরন্তর হত্যা করা হচ্ছে। রেড রোডে ইদের নামাজে মুখ্যমন্ত্রীর উর্দু ভাষণ, ইসলামপুরে বাংলাভাষার শিক্ষকের জন্য আন্দোলনকারী রাজেশ ও তাপসের গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু, সরকারি নির্দেশিকায় অপ্রয়োজনীয় উর্দুর ব্যবহার, মেনকা গুরুস্বামী, ইরফান পাঠানদের মতো পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে সম্পর্কহীন মানুষদের লোকসভা ও রাজ্যসভায় জনপ্রতিনিধি করে পাঠানো এ কথার বড়ো প্রমাণ। তৃণমূলনেত্রীর ইকোসিস্টেমে থাকা পশ্চিমবঙ্গের স্বঘোষিত 'বাংলা প্রেমী'রা এই সমস্ত ঘটনা নিয়ে একেবারেই নীরব।

অর্থনৈতিক অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ গোটা দেশের মধ্যে পেছনের দিক থেকে তৃতীয় । রাজ্যের মোট জিডিপির ৩৫ শতাংশ চলে যাচ্ছে শুধুমাত্র ঋণের সুদ মেটাতে। গত ১৫ বছরে না হয়েছে কোনো শিল্প, চরম আকার ধারণ করেছে বেকারত্ব এবং পাল্লা দিয়ে বেড়েছে রাজ্যের শাসক দলের ভাতা রাজনীতি। একের পর এক স্কুল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, চাকরি বিক্রি হচ্ছে, রাজ্য সরকারের দুর্নীতির জন্য হাজার হাজার যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা চাকরি হারিয়ে হাহাকার করছেন। এ রাজ্যে আইনের শাসন বলে কিছু নেই, শাসকের শাসানি 'আইন' হিসেবে গণ্য হয়; হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্টের রায় মানা হয় না বললেই চলে। সব মিলে এক ভয়ঙ্কর অরাজক পরিস্থিতি। তারই মধ্যে উঠছে 'খেলা হবে' স্লোগান। 'ওয়াকফ আন্দোলন'-এর নামে জেহাদি তাণ্ডবের সময় জেহাদিদের হাতে আক্রান্ত মুর্শিদাবাদের হরগোবিন্দ দাস, চন্দন দাসের মৃত্যু যন্ত্রণা, বাংলাদেশের দীপুচন্দ্র দাসের শরীরে জ্বলন্ত আগুন তোলামূলি হার্মাদদের মনে খেলার অনুভূতি এনে দিয়েছিল। সেজন্য 'খেলা হবে' স্লোগান ওদের কাছে আনন্দের হতে পারে, কিন্তু এ রাজ্যের হিন্দুদের কাছে তা এক জীবন মরণের লড়াই। ঝাড়খণ্ডের পরিযায়ী শ্রমিক আলাউদ্দিন শেখের আত্মহত্যার পর রটিয়ে দেওয়া হয় বাংলা বলার জন্য ওকে নাকি পিটিয়ে মারা হয়েছে। এই অজুহাতে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় তিন দিন জাতীয় সড়ক অবরোধ হয়ে থাকে। চিকেন নেকের নিকটবর্তী অঞ্চলে এই ধরনের অবরোধ দেশের ঐক্য ও সংহতির জন্য ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক— এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এই অবরোধ নিয়ে কলকাতা হাইকোর্ট এনআইএ তদন্তের আদেশ দিলে তাকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে ছুটে যায়। এর থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে চিকেন নেক অঞ্চল জুড়ে দেশবিরোধী কার্যকলাপে বর্তমান রাজ্য সরকার সরাসরি মদত দিচ্ছে। খাগড়াগড় কাণ্ড থেকে শুরু করে গত ২৭ মার্চ শ্রীরামনবমী উৎসব উদ্‌যাপনের সময় মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর, রঘুনাথগঞ্জ এবং বীরভূমের নলহাটিতে জেহাদি তাণ্ডবের পর এ রাজ্য যে জেহাদি সন্ত্রাসবাদীদের ঘাঁটি হয়ে উঠেছে— এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ২০২৬-এর রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে হিন্দুরা যদি গণতান্ত্রিক লড়াইয়ের মাধ্যমে পরিবর্তন আনার জন্য নিশ্চিত না করেন, তাহলে এটাই হয়তো হবে পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালি হিন্দুদের জন্য সর্বশেষ নির্বাচন। □

‘লাভ জেহাদ’ বিতর্ক এবং হিন্দু সমাজের উদ্বেগ

বাস্তবতা, ধারণা ও প্রেক্ষাপট

অরুণ কুমার চক্রবর্তী

ভারত বিবিধতায় ভরা একটি দেশ। এখানে বিভিন্ন উপাসনা, ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সহাবস্থান রয়েছে। এই বৈচিত্র্যের মধ্যেই গড়ে উঠেছে একটি সামাজিক ব্যবস্থা, যেখানে ব্যক্তিগত সম্পর্ক, বিশেষ করে বিবাহ শুধু ব্যক্তিগত নয়, বরং পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। এই প্রেক্ষাপটে ‘লাভ জেহাদ’ শব্দবন্ধটি সাম্প্রতিক সময়ে একটি তীব্র বিতর্কের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। এটি একটি পরিকল্পিত প্রক্রিয়া, যেখানে প্রেম ও বিবাহকে ব্যবহার করে ধর্মান্তর ঘটানো হয়।

‘লাভ জেহাদ’ শব্দটি দুটি অংশ নিয়ে গঠিত--- ‘লাভ’ (প্রেম) এবং ‘জেহাদ’ (মজহবি সংগ্রাম)। ‘লাভ জেহাদ’ শব্দটির মূল অর্থ ইসলাম অনুসারে বহুমাত্রিক— এটি আত্মশুদ্ধি থেকে শুরু করে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু ‘লাভ জেহাদ’ শব্দবন্ধে এটি একটি নেতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যা একটি বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক প্রতারণা ও ধর্মান্তরের ধারণা প্রকাশ করে। এই শব্দবন্ধটি মূলত একটি রাজনৈতিক ও সামাজিক যুদ্ধ, যা গণমাধ্যম, জনমত ও রাজনৈতিক বক্তব্যের মাধ্যমে জনপ্রিয়তা পায়।

‘লাভ জেহাদ’ ধারণাটি প্রথম ব্যাপকভাবে আলোচনায় আসে দক্ষিণ ভারতে, বিশেষ করে কেরালা ও কর্ণাটকে ২০০০ থেকে ২০১০ সালের মাঝামাঝি সময়ে। কিছু সংগঠন দাবি করে যে হিন্দু ও খ্রিস্টান নারীদের প্রেমের অভিনয়ের মাধ্যমে টার্গেট করা হচ্ছে এবং পরে তাদের ধর্মান্তরিত করা হচ্ছে। এই অভিযোগের ভিত্তিতে বিভিন্ন তদন্ত শুরু হয়।

বিষয়টি নিয়ে পুলিশ এবং অন্যান্য সংস্থা তদন্ত চালায়। পরবর্তীকালে National Investigation Agency-ও কিছু মামলায় অনুসন্ধান করে। তদন্তে দেখা যায়— বেশ কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা রয়েছে।

ব্রিটিশ শাসনে ‘divide and rule’ নীতি ভারতীয় সমাজে হিন্দু-মুসলমান বিভাজনকে আরও তীব্র করে তোলে। এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট স্বাধীনতার পরেও সমাজে রয়ে যায়। ধর্মীয় পরিচয় রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিচয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে ওঠে, যা পরবর্তীকালে ‘লাভ জেহাদ’-এর মতো কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

২১ শতকে গণমাধ্যম, সোশ্যাল মিডিয়া ও রাজনৈতিক বক্তব্যের মাধ্যমে ‘লাভ জেহাদ’ শব্দবন্ধটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এই প্রসঙ্গে কিছু সংবাদ চ্যানেল এই বিষয়টিকে তুলে ধরে ও সত্য ঘটনা সামনে এসে যায়, ফলে একটি সামাজিক আলোড়ন সৃষ্টি হয়।

এই প্রক্রিয়ার ফলে হিন্দু সমাজের একটি অংশে উদ্বেগ পরিলক্ষিত হয়। ধর্মীয় পরিচয়ের সুরক্ষা, পারিবারিক ও সামাজিক কাঠামোর স্থায়িত্ব ও নারীর নিরাপত্তা নিয়ে বাড়ে উদ্বেগ। এই উদ্বেগগুলো বাস্তবে সামাজিক মনস্তত্ত্বের অংশ, যা অস্বীকার করলেও ঘটনা ঘটে চলেছে।

সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে ‘লাভ জেহাদ’ শব্দটিকে একটি ‘social construct’ বা সামাজিক বিষয় হিসেবে দেখা যেতে পারে। এই ধরনের সামাজিক ইস্যু প্রায়ই ‘moral panic’ তৈরি করে, যেখানে কোনো সমাজ একটি নির্দিষ্ট বিষয়কে রীতিমতো ভয়ের উৎস হিসেবে দেখতে শুরু করে।

‘লাভ জেহাদ’ নিয়ে তৈরি হওয়া উদ্বেগকে শুধুমাত্র রাজনৈতিক বা কল্পিত বলে উড়িয়ে দিলে বিষয়টির গভীরতা বোঝা যায় না। বরং এটিকে একটি সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে বিশ্লেষণ করা জরুরি।

আধুনিক সময়ে দ্রুত সামাজিক পরিবর্তনের ফলে অনেক সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিচয়-সংকট দেখা যায়। এই প্রেক্ষাপটে আন্তঃধর্মীয় সম্পর্ককে অনেক সময় ‘বিপদ’ হিসেবে দেখা হয়।

বেশ কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে নির্দিষ্ট মজহবি গোষ্ঠী জনসংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার করতে চায়। তারা ভারতীয় সীমানা ভেদ করে অনুপ্রবেশ করছে, তা সে বাংলাদেশি হোক বা রোহিঙ্গা। পশ্চিমবঙ্গ হয়ে তারা সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ছে। একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষ নিজের মজহবকে আড়াল করে, নাম বদল করে নিচ্ছে, যাতে তাদের পরিচয় গোপন থাকে এবং নাম শুনে মনে হয় হিন্দু। এই সুযোগটি কাজে লাগিয়ে তারা হিন্দু মেয়েদের বোকা বানিয়ে প্রথমে প্রেমের জালে আবদ্ধ করছে এবং তারপর বিবাহ/নিকাহ করে তাদের ধর্ম পরিবর্তন করছে বল প্রয়োগের মাধ্যমে।

ভারতীয় সমাজে পরিবার একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। বিবাহকে শুধু ব্যক্তিগত নয়, সামাজিক সম্পর্ক হিসেবে দেখা হয়, সেখানে পরিবারের সম্মান অনেক সময় নারীর আচরণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। এই কারণে আন্তঃধর্মীয় সম্পর্ক অনেক সময় পরিবারে উদ্বেগ সৃষ্টি করে। ‘লাভ জেহাদ’ বিতর্কের কেন্দ্রে রয়েছে অমুসলমান নারী— বিশেষ করে হিন্দু নারী। ‘লাভ জেহাদ’ বিষয় যে ঘটনা কিছু নারীদের প্রায়শই মুখোমুখি হতে হচ্ছে তার বাস্তব চিত্র হলো--- ‘প্রতারিত’ (মিথ্যে পরিচয় দিয়ে বিয়ে করে ধর্ম পরিবর্তন করানো), ‘নিরীহ’ ও ‘রক্ষার প্রয়োজন’, যা সমাজের চিন্তাশীল মানুষের ভীষণ ভাবেই ভাবা দরকার।

সমাজবিজ্ঞানী Stanley Cohen-এর

'moral panic' ধারণা এখানে প্রযোজ্য, যেখানে একটি সমাজ কোনো বিষয়কে অতিরিক্ত ভয়ের উৎস হিসেবে দেখতে শুরু করে। 'লাভ জেহাদ' অনেক ক্ষেত্রে এই ধরনের একটি সামাজিক প্রতিক্রিয়া। এই বিষয়টি প্রায়ই রাজনৈতিক আলোচনায় ব্যবহৃত হয়।

পরিচয়ের রাজনীতি : মজহবি পরিচয়কে কেন্দ্র করে ভোটব্যাংক রাজনীতি গড়ে ওঠে।

আইন প্রণয়ন : উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ-সহ বিভিন্ন রাজ্যে লাভ-জেহাদ প্রতিরোধী আইন তৈরি হয়েছে। এই আইনগুলির পক্ষে যুক্তি— জোরপূর্বক ধর্মান্তর রোধ।

সামাজিক বাস্তবতা : সম্পর্কের জটিলতা : বাস্তবে আন্তঃধর্মীয় সম্পর্ক— প্রেম, সামাজিক চাপ, অর্থনৈতিক কারণ এবং ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা, সবকিছুর মিশ্রণ।

'লাভ জেহাদ' হিন্দু সমাজের উদ্বেগ : আইন, বিচারব্যবস্থা ও কেস স্টাডি এবং ভারতের সংবিধান ও মৌলিক অধিকার :

ভারতের সংবিধান নাগরিকদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করে।

ব্যক্তিগত স্বাধীনতা : ভারতীয় সংবিধানের ২১নং ধারা অনুযায়ী জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার নিশ্চিত এবং এতে নিজের জীবনসঙ্গী নির্বাচন করার স্বাধীনতাও অন্তর্ভুক্ত।

ধর্মীয় স্বাধীনতা : ভারতীয় সংবিধানের ২৫নং ধারা অনুযায়ী ধর্ম পালন ও প্রচারের অধিকার, এই অধিকারগুলি 'লাভ জেহাদ' বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে।

বিচারব্যবস্থার অবস্থান : ভারতের সুপ্রিম কোর্ট একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রায়ে ব্যক্তিস্বাধীনতার পক্ষে অবস্থান নিয়েছে।

Case (Shafin Jahan vs. Asokan K.M., 2018) :

এই মামলায় একজন প্রাপ্তবয়স্ক নারী নিজের ইচ্ছায় ধর্মান্তরিত হয়ে বিবাহ করেন, সেখানে পরিবার এই বিবাহকে চ্যালেঞ্জ করে।

আদালতের রায় : 'প্রাপ্তবয়স্ক নারীর নিজের পছন্দমতো জীবনসঙ্গী বেছে নেওয়ার অধিকার রয়েছে'। কিন্তু যেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সেটি হলো, কোনোভাবে নারীকে চাপের মধ্যে রেখে তাকে বয়ান দিতে হচ্ছে না তো, যা আসলে 'লাভ জেহাদ'-এরই একটি অংশ?

Lata Singh Case (2006) : এই মামলায় আদালত জানায়— আন্তঃধর্মীয় ও আন্তঃজাতিগত বিবাহ বৈধ। প্রাপ্তবয়স্কদের এই সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়।

তদন্তকারী সংস্থার ভূমিকা : 'লাভ জেহাদ' অভিযোগের তদন্তে বিভিন্ন সংস্থা যুক্ত হয়েছে।

National Investigation Agency (NIA) : NIA কিছু হাই-প্রোফাইল মামলায় তদন্ত চালায়।

তদন্তের ফলাফল : বেশ কিছু ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও ধর্মান্তর ঘটেছে।

রাজ্যভিত্তিক আইন ও বিশ্লেষণ : ভারতের কয়েকটি রাজ্যে ধর্মান্তর বিরোধী আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

Uttar Pradesh Freedom of Religion Act (2021) :

একই ধরনের বিধান, কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা।

আইনের পক্ষে যুক্তি : প্রতারণা ও জোরপূর্বক ধর্মান্তরণ রোধ ও নারীদের সুরক্ষা।

কেস স্টাডি বিশ্লেষণ : Case Study 1 : Kerala Conversion Cases : কেরালাতে কিছু মামলায় ধর্মান্তরের অভিযোগ ওঠে। তদন্তে দেখা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্পর্ক স্বেচ্ছায়, জোরপূর্বক প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অনেকের ধারণা একটি বড়ো চক্র কাজ করছে এর পেছনে।

Case Study 2 : Uttar Pradesh অভিযোগসমূহ : উত্তরপ্রদেশে কিছু মামলায় গ্রেপ্তার হয়। কিন্তু পরবর্তীতে অনেক ক্ষেত্রে প্রমাণের অভাবে মামলা দুর্বল হয়ে পড়ে। অনেকের অভিযোগ এখানে পেছন থেকে অর্থ ও ক্ষমতাবান মানুষ (চক্র)-এর হাতও থাকে।

Case Study 3 : পারিবারিক বিরোধ বনাম অপরাধ : অনেক ক্ষেত্রে পরিবার আন্তঃধর্মীয় সম্পর্ক মেনে নিতে চায় না, ফলে 'লাভ জেহাদ' অভিযোগ আনা হয়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বাস্তবতা।

আইনি বাস্তবতা বনাম সামাজিক ধারণা : আইনি বিশ্লেষণে দেখা যায়, জোরপূর্বক ধর্মান্তর একটি অপরাধ। কিন্তু সব আন্তঃধর্মীয় সম্পর্ক অপরাধ নয়। এই পার্থক্য বোঝা অত্যন্ত জরুরি।

পুলিশ ও প্রশাসনের ভূমিকা : এই ধরনের মামলায় অনেক সময় সামাজিক চাপের কারণে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হলেও তদন্তে অনেক অভিযোগ টেকে না। ফলে আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। অনেকেই মনে করেন যে এর পেছনে বড়ো ধরনের একটি চক্র কাজ করে, যাদের অর্থ ও ক্ষমতা দুইই আছে। ফলে তারা খুব সহজে অনেক কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সমগ্র বিতর্কের সমন্বিত বিশ্লেষণে বলা যায় 'লাভ জেহাদ' একটি বহুস্তরীয় ধারণা, যা— সামাজিক ভয়, রাজনৈতিক বক্তব্য, মিডিয়ার উপস্থাপনা ও বাস্তব বেশ কিছু ঘটনা। এটি শুধুমাত্র একটি আইনগত বা অপরাধমূলক বিষয় নয়; বরং এটি একটি সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতা।

এই বিতর্কের কেন্দ্রে একটি মৌলিক প্রশ্ন রয়েছে— 'এটি কি একটি সুসংগঠিত ষড়যন্ত্র একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের, নাকি একটি অতিরঞ্জিত সামাজিক ধারণা?'

এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে, 'লাভ জেহাদ' একটি সামাজিক বাস্তবতা— বাস্তব ঘটনা থেকে উদ্ভূত।

সমাজবিজ্ঞানী Stanley Cohen-এর ধারণা অনুযায়ী— সমাজ কখনো কখনো একটি বিষয়কে অতিরিক্ত ভয়ের উৎস হিসেবে দেখে এবং 'লাভ জেহাদ' অনেক ক্ষেত্রে সেই ধরনের একটি উদাহরণ।

জোরপূর্বক ধর্মান্তর হলে কঠোর ব্যবস্থা, কিন্তু স্বেচ্ছাসিদ্ধ সম্পর্কের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ নয়। মিডিয়ার দায়িত্বশীল ভূমিকা হলো— যাচাই করা তথ্য প্রচার ও অতিরঞ্জন এড়ানো। 'লাভ জেহাদ' বিতর্ক একটি জটিল সামাজিক বাস্তবতা, যা— বাস্তব ঘটনার উপর ভিত্তি করেই জনগণের সামনে চলে আসে এবং সেখান থেকেই হিন্দু সমাজের মধ্যে ভয় সঞ্চারিত হয়। □

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী কি ভারতীয় সংবিধানেরও ঊর্ধ্বে?

আমারা জানি, ভারতবর্ষের কোনো নাগরিকই ভারতীয় সংবিধানের ঊর্ধ্বে নন। তা তিনি ধন-সম্পদ-যশ-মান-খ্যাতি-প্রতিপত্তিতে যতই দড় হোন না কেন। অথচ ভারতের সম্মাননীয় রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, নির্বাচন কমিশনার, হাইকোর্ট, সুপ্রিমকোর্ট, রাজ্যপাল, এমনকী সেনাবাহিনীকেও যথেচ্ছ অপমান করা মুখ্যমন্ত্রীর স্বভাবে পরিণত হয়েছে। আর তাঁর ভাতাজীবী ঘৃণ্য চাটুকারেরা তাঁকে কখনো দশভুজা, কখনো মাতা রানি রাসমণি, কখনো সারদা মায়ের সঙ্গে তুলনা করে নির্লজ্জের মতো আত্মপ্রসাদ লাভ করতেও দ্বিধা করেন না।

অতি সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর শ্রীমুখ থেকে সদম্ভ তথা ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে এক সাবধানবাণী উচ্চারিত হয়েছে— 'আমরা আছি— তাই আপনারা নিশ্চিন্তে সুখে-শান্তিতে আছেন। যদি কোনো কারণে আমরা না থাকি, তাহলে একটা কমিউনিটি এক সেকেন্ডে আপনাদের বারোটা বাজিয়ে ছেড়ে দেবে।' বলাই বাহুল্য যে, এটা হিন্দুদের উদ্দেশে।

এখন প্রশ্ন হলো, এই সদম্ভ-সতর্কবার্তার মাধ্যমে তিনি কোন কমিউনিটিকে উসকে দিলেন? উত্তর--- অবশ্যই জেহাদি মুসলমানদের। অর্থাৎ তিনি সদম্ভে এই বলে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের বলতে চাইছেন, 'হে পশ্চিমবঙ্গের দুর্ভাগা হিন্দু সমাজ, তোমরা তো নির্জীব ভীরু-কাপুরুষের দল, তাই একমাত্র আমিই তোমাদের পরিত্রাতা, আমার দয়াতেই তোমরা বেঁচে আছ। তোমরা যদি আমাকে ক্ষমতাচ্যুত করো, তাহলে আমি এমন একটি কমিউনিটিকে 'ওয়েল ট্রেন্ড' করে রেখেছি— যাঁরা আমার অঙ্গুলিহেলনে মাত্র এক সেকেন্ডের মধ্যে তোমাদের বারোটা বাজিয়ে ছেড়ে দেবে!'

এবার একটু ভেবে দেখা যাক সেই অকুতোভয় মহাশক্তিধর বলে মুখ্যমন্ত্রী কাদের বোঝাতে চাইছেন। খ্রিস্টান-বৌদ্ধ-জৈন-শিখ বা পার্সিদের? নিশ্চয়ই না। কারণ উল্লিখিত ধর্মাবলম্বীদের কারও সংখ্যাই দুই শতাংশের বেশি নয়। তাই তাঁদের দ্বারা পশ্চিমবঙ্গের ৬৬ শতাংশ হিন্দুদের এক সেকেন্ডের মধ্যে বারোটা বাজিয়ে দেবার প্রশ্নই উঠে না। এখন অবশিষ্ট রইল একমাত্র মুসলমান কমিউনিটি।

অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী প্রকারান্তরে সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়কে নৃশংস দাঙ্গাবাজ বলে কলঙ্কিত করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করলেন না। আর হিন্দুরা হলো তাঁর কাছে নির্জীব- ভীরু-কাপুরুষ!

আচ্ছা বলুন তো, মুসলমান সম্প্রদায়ের সবাই কী ঘৃণ্য দাঙ্গাবাজ? নিশ্চয়ই না। বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি কালাম, হাজী মহম্মদ মহসীনরা কী মুসলমান নন? আর সমগ্র হিন্দু সমাজের সবাই কী নির্জীব-ভীরু-কাপুরুষ? ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে হিন্দুদের ত্যাগ ও বীরত্বের অবিস্মরণীয় অবদান কি বিশ্ববিদিত নয়? এর পরেও হিন্দুরা নীরব থাকে কী করে?

—বিনয়কৃষ্ণ দাশ,
উত্তমাশা, বালুরঘাট, দ: দিনাজপুর।

গণতন্ত্রে সম্মান কার— জনপ্রতিনিধি না জনগণ?

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনপ্রতিনিধিরা জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতার আসনে বসেন। বিধায়ক ও সংসদ সদস্যরা দেশের প্রশাসনিক ও নীতিনির্ধারণী কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সেই কারণে সরকার তাঁদের জন্য বেতন, ভাতা ও নানা সুযোগ- সুবিধার ব্যবস্থা করে রেখেছে। এই ভাতা ও সুবিধার পরিমাণ এতটাই উল্লেখযোগ্য যে অনেক ক্ষেত্রে তা সরকারি উচ্চপদস্থ প্রথম শ্রেণীর আধিকারিকদের আর্থিক সুযোগসুবিধাকেও ছাড়িয়ে যায়।

কিন্তু এই ব্যবস্থার মধ্যেই একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈপরীত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যাঁদের ভোটে জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচিত হন, সেই সাধারণ জনগণের একটি বড়ো অংশ এখনো অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যে জীবনযাপন করছেন। গ্রাম থেকে শহর— সব জায়গাতেই অসংখ্য মানুষ দৈনন্দিন জীবনধারণের জন্য সংগ্রাম করে চলেছেন।

গণতন্ত্রের প্রকৃত শক্তি হলো সাধারণ মানুষ। তাঁদের মতামত ও ভোটের মাধ্যমেই দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নির্ধারিত হয়। অথচ বাস্তব পরিস্থিতি এমন যে এই জনগণের বড়ো অংশ আর্থিক দিক থেকে প্রান্তিক অবস্থায় রয়ে গেছে। ফলে প্রশ্ন উঠছে— যদি জনপ্রতিনিধিরা সরকারের কাছ থেকে সম্মানভাতা পান, তাহলে সেই জনগণ, যারা তাঁদের নির্বাচিত করেন, তাদের জন্যও কি কোনো ন্যূনতম আর্থিক সম্মানভাতার ব্যবস্থা থাকা উচিত নয়?

বর্তমানে বিভিন্ন সামাজিক কল্যাণমূলক প্রকল্পের মাধ্যমে সরকার কিছু আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। কিন্তু এসব প্রকল্প প্রায়শই সীমিত ও স্থায়ী সমাধান দিতে পারে না। তাই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে একটি নতুন ভাবনা সামনে আসছে— দেশের প্রান্তিক ও আর্থিকভাবে দুর্বল সাধারণ মানুষের জন্য মাসিক ন্যূনতম ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকার সম্মানভাতা চালু করা। এই ধরনের উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে শুধু মানুষের আর্থিক নিরাপত্তাই বাড়বে না, বরং তাদের সামাজিক মর্যাদাও বৃদ্ধি পাবে। পাশাপাশি এটি অর্থনৈতিক বৈষম্য কমানোর ক্ষেত্রেও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হতে পারে। গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি যখন জনগণ, তখন সেই জনগণের ন্যূনতম আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা দেশের সরকারের নৈতিক দায়িত্ব। তাই সময়ের দাবি— জনপ্রতিনিধিদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের জন্যও একটি সম্মানভাতার ব্যবস্থা নিয়ে গুরুত্ব সহকারে ভাবনাচিন্তা করা হোক।

—কুন্তল চক্রবর্তী,
খয়রামারি বনগাঁ, উ: ২৪ পরগনা।

আমরা আজ যা পাচ্ছি তা কীসের বিনিময়ে ?

অনেক সময় আমরা যা কামনা করি তা পেয়ে যাই। তখন অবশ্যই আনন্দ পাই। বিশেষ করে টাকা পেলেই আনন্দ বেশি হয়। কারণ টাকা ছাড়া দুনিয়া চলে না। আমরা যাই পাই না কেন তার পিছনে একটা বিনিময় থাকে। এই যে আমরা নানান ধরনের ভাতা পাই সেখানেও একটা বিনিময় আছে। যারা ভাতা দিচ্ছেন তারা তার বিনিময়ে আপনাদের সমর্থন (ভোট) আশা করেন। এই প্রসঙ্গে ইংরেজিতে একটা গল্প আছে— At the cost of what? একজন খ্রিস্টান প্রিস্ট এক ঝড়-জলের সন্ধ্যায় এক গৃহস্থের বাড়িতে আশ্রয় চান। গৃহস্থ তাকে ভিতরে ডেকে নিশ্চিন্তে বসতে অনুরোধ করেন। তারপর ভিতরে গিয়ে বাড়ির মেয়েদের ওই প্রিস্টের জন্য খাওয়ার ব্যবস্থা করতে বলে ফিরে আসেন।

লক্ষ্য করেন ওই প্রিস্টের লং কোর্টের পকেট থেকে কোনো জন্তুর পায়ের থাবা বেরিয়ে রয়েছে। গৃহস্থ কার পায়ের থাবা প্রশ্ন করতে প্রিস্ট উত্তর দেন, এটা একটা বানরের পায়ের থাবা। এ খুব পয়া। একে কোলে নিয়ে যা কামনা করা হয়— তাই পাওয়া যায়। গৃহস্থের ওই সময় (ওদেশের মুদ্রায়) কিছু অর্থের প্রয়োজন ছিল। তাই গৃহস্থ তাকে কোলে নিয়ে কিছু কামনা করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। প্রিস্ট তার কোলে বানর ছানাকে দেন। গৃহস্থ মনে মনে তার ইচ্ছা কামনা করেন।

পরের দিন সকালে ঝড় বৃষ্টি থামলে প্রিস্ট গৃহস্থের বাড়ি থেকে প্রস্থান করেন। বাড়ির সকলে যে যার কাজে চলে যায়। সকাল থেকে দুপুর গড়ায়। এমন সময় এক অচেনা মানুষ গৃহস্থের বাড়ির দরজায় কড়া নাড়ে। দরজা খুলতেই সেই অচেনা মানুষটি তার হাতে এক বন্ধ খাম তুলে দেন। গৃহস্থ ঘরে ঢুকে খাম খুলে দেখেন, তিনি যে পরিমাণ অর্থ আগের দিন কামনা করেছিলেন ঠিক সেই পরিমাণ অর্থের একটা ড্রাফ্ট এসেছে। গৃহস্থ খুব আনন্দিত হয়। ঠিক পরক্ষণেই তার জানতে ইচ্ছা করে কে এই ড্রাফ্ট দিল? তখন তিনি ওই অচেনা মানুষটিকে চিৎকার করে পিছন থেকে ডাকলেন। তাকে জিজ্ঞাসা করেন, কে এই খাম পাঠিয়েছেন? অচেনা মানুষটি শান্ত গলায় বললেন, আপনার ছেলে যে সংস্থায় কাজ করতো আমি সেই সংস্থার কর্মী।

আমাদের সংস্থায় কর্মরত অবস্থায় কেউ মারা গেলে এই পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। আপনার ছেলে গতকাল কর্মরত অবস্থায় মারা গেছেন। তাই এটা ক্ষতি পূরণের প্রথম কিস্তি। গল্প এখানেই শেষ।

প্রশ্ন এখানে, আমরা আজ ভাতার নামে যে টাকা পাচ্ছি তার বিনিময়ে আমাদের কী দিতে হবে? শুধু কি ভোট? যদি ওই গৃহস্থের মতো সন্তান বা নিদেনপক্ষে ভিটেটুকু ছাড়তে হয় তাহলে কী হবে? মনে রাখতে হবে, যা পাচ্ছি তা কীসের বিনিময়ে?

—শ্যামল কুমার হাতি,
চাঁদমারি রোড, হাওড়া-৯।

বুদ্ধি বনাম বোধ

মানুষের জীবনে 'বুদ্ধি' ও 'বোধ' এই দুটি শব্দ প্রায় একে অপরের সমার্থক বলে মনে করা হয়। কিন্তু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, এই দুটির মধ্যে সূক্ষ্ম অথচ মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। বুদ্ধি মানুষকে চিন্তা করতে শেখায়, বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করে; কিন্তু বোধ মানুষকে সঠিক এবং ভুলের বিচার করতে শেখায়; মানবিকতা ও নৈতিকতার পথে পরিচালিত করে। তাই বুদ্ধি থাকলেই যে একজন মানুষ সত্যিকারের প্রাজ্ঞ বা সমাজোপযোগী হয়ে উঠবে, এমনটি মোটেই নয়। বরং বুদ্ধি যদি বোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়, তাহলে সেটি সমাজের জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে।

আমাদের সমাজে এমন বহু মানুষ আছেন, যাদের বুদ্ধির প্রখরতা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁদের মধ্যে বোধের গভীর অভাব লক্ষ্য করা যায়। এরা যুক্তি দিতে পারেন, তর্ক করতে পারেন, অন্যকে কোণঠাসা করতে পারেন কিন্তু, তাঁদের যুক্তির ভিতরে থাকে না নৈতিকতা বা সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা। ফলে তাঁদের সঙ্গে যুক্তিসঙ্গত আলোচনা বা বিতর্ক প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। কারণ তাঁরা তর্কের উদ্দেশ্য হিসেবে সত্যের সন্ধান করেন না। তাঁদের উদ্দেশ্য প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা কিংবা অপরপক্ষকে হেয় করা।

এই ধরনের ব্যক্তিদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, তাঁরা আলোচনা বা বিতর্ককে এমন এক নিম্নস্তরে নামিয়ে আনেন, যেখানে একজন বোধসম্পন্ন, নৈতিক ব্যক্তি নিজের মর্যাদা বজায় রেখে আর অংশগ্রহণ করতে পারেন না। তারা ব্যক্তিগত আক্রমণ, বিকৃত তথ্য, উসকানি এসবের মাধ্যমে পরিবেশকে দূষিত করে তোলেন। এর ফলে সমাজে এক ধরনের নীরব বিপর্যয় ঘটে, সেখানে বোধসম্পন্ন মানুষরা পিছিয়ে পড়েন আর অবিবেচক, স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিরা সামনে এগিয়ে যান।

এখানেই তৈরি হয় গভীর সামাজিক সংকট। কারণ সমাজ তখন এমন এক পথে এগোতে থাকে যেখানে বুদ্ধি আছে, কিন্তু বোধ নেই; জ্ঞান আছে, কিন্তু প্রজ্ঞা নেই; ক্ষমতা আছে, কিন্তু দায়িত্ববোধ নেই। এই পরিস্থিতি দীর্ঘস্থায়ী হলে তা সমাজের নৈতিক ভিত্তিকে দুর্বল করে দেয়। মানুষের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহমর্মিতা ও সত্যের প্রতি অনুরাগ ক্রমশ বিলুপ্ত হতে থাকে। এর ফলস্বরূপ সমাজে বিভাজন, সংঘাত ও অবিশ্বাস বাড়তে থাকে।

তাই জীবনে সর্বাগ্রে এবং সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করতে হবে এমন এক সমাজ গড়ে তুলতে, যেখানে বুদ্ধি ও বোধের সুষম সমন্বয় থাকবে। যেখানে মানুষ শুধু তর্ক করতে করতে জানবে না, বরং সত্যকে গ্রহণ করতে শিখবে; যেখানে জয়লাভের চেয়ে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা অধিক গুরুত্বপূর্ণ হবে। অন্যথায়, বুদ্ধিহীন নয়; বোধহীন বুদ্ধির দৌরাত্ম্যে সমাজ ধীরে ধীরে এক গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হতে বাধ্য।

—সলিল কুমার ঘোষ,
সুনীলতা, হাকিম পাড়া, জলপাইগুড়ি।

সুসম্পর্ক বজায় রাখলে সামাজিক বন্ধন দৃঢ় হয়

মৌ চৌধুরী

ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কথাটার সঙ্গে সকলেই পরিচিত। তাদের কী কাজ সকলেই জানেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে টাকা দিলেই তারা অর্ডার অনুযায়ী যাবতীয় দায়িত্ব পালন করে দেয়। যে পরিবারের বা সংস্থার অনুষ্ঠান তাদের কোনো কাজেই হাত দিতে হয় না। বিশেষ করে বিয়ে বাড়ি হলে তো কথাই নেই। ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের দৌলতে যাদের বাড়িতে বিয়ে তারাও যেন কতকটা আমন্ত্রিত অতিথির মতোই। কেবলমাত্র সেজেগুজে ভোজ খেয়ে ফিরে যাওয়া। আত্মীয় স্বজনদের ভোজের আসরে ছাড়া সক্রিয় উপস্থিতিও যেন নেই। অনেক ক্ষেত্রেই কেবলই দেখনদারি মাত্র।

এখন অনেকেই নিজেকে নিয়েই, নিজের স্বাচ্ছন্দ্যের ভেতরে, নিজের পরিমণ্ডলে থাকতে ভালোবাসেন। সময়ে-অসময়ে কাউকেই যেন আর প্রয়োজন নেই। আত্মকেন্দ্রিক পরিবার সব। একটা সময় ছিল, যেকোনো পারিবারিক অনুষ্ঠানে নিকট বা দূরের সম্পর্কিত আত্মীয়দের আমন্ত্রণ জানানো, তাদের নিয়ে অনুষ্ঠান পার করার বিশাল আয়োজন ছিল।

একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত বেঙ্গলি ম্যাট্রিমনির প্রয়োজন হতো না। আত্মীয়-পরিজন-বন্ধুরাই হয়ে উঠতেন বিবাহ বন্ধনের যোগসূত্র। তারপর বিয়ে স্থির হলে পাত্র-পাত্রীর বন্ধনের আগেই কত অছিলায় দুই বাড়িতে যাতায়াত লেগেই থাকত। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এভাবেই দুটি পরিবার ও তাদের আত্মীয়দের ভেতর সম্পর্ক গড়ে উঠত। প্রশ্ন উঠতেই পারে, সম্পর্ক তো গড়তেই পারে কিন্তু সেটা সবসময় সুখের হয় কি? অনেক ক্ষেত্রেই বিয়ের পার স্বামী স্ত্রী বা দুই পরিবার বা আত্মীয়দের ভেতর সম্পর্কের টানাপোড়েন ছিলই। পারিবারিক হিংসা, যৌতুক নিয়ে মনান্তর, অর্থনৈতিক স্থিতি, 'কান ভাঙ্গানো', অনেক কারণেই বিবাদ, মতান্তর হতো। কিন্তু সম্পর্কের সামাজিক স্থিতি নষ্ট হতো না। শোকের সময় বা কাজের প্রয়োজনে আনন্দ-অনুষ্ঠানে মনোমালিন্য ভুলে সবাই এগিয়ে আসতেন। তবে ভাববার কোনো কারণ নেই যে আগে সবটাই ভালো ছিল।

গভীর উদ্বেগের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে ভারতীয় পরিবারগুলিও পারিবারিক রীতি ভেঙে এখন ছোটোপরিবারে রূপান্তরিত হচ্ছে। নিম্নমধ্যবিত্ত থেকে শুরু করে উচ্চবিত্ত সকলেই পারিবারিক বা সামাজিক সম্পর্কগুলো এড়িয়ে চলে।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত মামা মাসিদের বাদ দিয়ে ঠাকুর্দা-ঠাকুমা, জ্যেঠা-পিসি-কাকারা ছিল বাইরের মানুষ। জেন জির ভাষায় 'ডিসট্রার্বিং এলিমেন্ট'। এখন মা-বাবা আর যদি থাকে ভাই বা বোন তারা 'নিয়ারেস্ট রিলেটিভ।' খুড়তুতো, পিসতুতো, মামাতো ভাই-বোন এখন জাস্ট ফ্রেন্ড বা মোস্ট বোরিং। এর পাশাপাশি সেই চিরন্তন কথা, কেরিয়ার তৈরি করা পড়ার চাপ, টিচারের কাছে পড়া। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আনন্দহীন বাধ্যতামূলক ক্যারাটে, অন্যান্য খেলা, ভায়োলিন, গিটার বাজানো গান-নাচ শেখা ইত্যাদি। তার উপর সামাজিক মাধ্যমের অনৈতিক দৃশ্যাবলী। হাটবাজার, শৌখিন জিনিস কেনা এখন অনলাইন। বিভিন্ন উৎসবে বিশেষ করে পূজার সময় আত্মীয়দের ভেতর উপহার বিনিময়, সেই সূত্রে পরস্পরের বাড়িতে যাওয়ার আনন্দ হারিয়ে গিয়েছে। এছাড়া, যাদের বাড়িতে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয় তাদের পারিবারিক আনন্দই ছিল আলাদা।

এখনকার প্রজন্ম পারিবারিক সম্পর্কগুলো জানেই না। ক্যারিয়ার সর্বস্ব আর টার্গেট নির্ভর মাঝারি বেতনের অনিশ্চিত চাকরি জীবন, তারই মাঝে কোথাও হয়তো একটু বেড়াতে যাওয়া। গার্লফ্রেন্ড, বয়ফ্রেন্ড ঘনঘন পরিবর্তন। নেশা করা। বিয়ে, ডিভোর্স আবার বিয়ে আবার ডিভোর্স। সঙ্গে আবার বিভিন্ন অসুখবিসুখ।

প্রশ্ন ওঠে, এই তিক্ত ও পরিজনহীন আবেগ ভালোবাসা হারানো, হতাশ হয়ে যাওয়া জীবন কি মানব সভ্যতার আধুনিকতার নিদর্শন? সমাজ বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসা অসম্ভব। সবাই 'নিজের কাজে ব্যস্ত'। তারই মাঝে সন্তান যখন ছোটো থাকে তখন থেকেই পছন্দের বিভিন্ন আত্মীয় বন্ধুদের সঙ্গে বাবা মায়ের যোগাযোগ, যাতায়াত বাড়ানো প্রয়োজন। হয়তো সবাই সাড়া দেবে না। ইগোর সমস্যা থাকে। ইনফিউরিটি কমপ্লেক্স। গায়ে পড়া ভাবতেও পারে। তবুও এগিয়ে যাওয়া দরকার। নিদেনপক্ষে দিনে একবার করে ফোন করা বা মেসেজ করা যেতেই পারে। যারা একদমই এড়িয়ে যাবে তাদের বাদ দেওয়াই ভালো। কিন্তু কিছু মানুষ অবশ্যই সাড়া দেবে। দেখা যাবে সন্তানের ভেতর এই অভ্যাস গড়ে উঠছে। এটাই হবে আপনার প্রাপ্তি। পাশাপাশি খুব দ্রুত মোবাইল, ল্যাপটপ থেকে সরিয়ে গল্পের বই হাতে তুলে দিন। ফলে আপনার সন্তানের অন্তত বন্ধু পরিজনহীন হতাশাগ্রস্ত অন্ধকারের দিকে এগিয়ে যাওয়া জীবন হবে না। প্রয়োজনে তারাই আপনার সন্তানের পাশে থাকবে। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়দের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে উঠলে সামাজিক বন্ধন দৃঢ় হবে। সামাজিক বন্ধন দৃঢ় হলে সমাজ এগিয়ে যাবে, ভবিষ্যতে মা-বাবাও সন্তান থেকে অন্তত মানসিক ভাবে দূরে থাকবেন না। □

ব্রণর অবহেলা না করে শুরুতেই চিকিৎসার প্রয়োজন

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

মুখের নানা রকম সমস্যার মধ্যে জ্বলন্ত একটি সমস্যা হলো ব্রণ। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই এটা নিয়ে বেশ উদ্বিগ্ন থাকেন। মূলত অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, অনিয়মিত খাওয়াদাওয়া, তেলজাতীয় বা ভাজাভুজি বেশি খাওয়া, অপর্যাপ্ত জল পান এবং সর্বোপরি ত্বকের পর্যাপ্ত যত্ন না নেওয়ার কারণে ব্রণ হয়। তবে তৈলাক্ত ত্বক বা খাদ্যাভ্যাসই ব্রণর একমাত্র কারণ নয়। বয়স বা হরমনের প্রভাবও দায়ী। সেখানেও শেষ নয়। ব্রণ কিন্তু এ সবের ঊর্ধ্বে গিয়ে অন্য অসুখের কারণেও হতে পারে।

কেন হয় ব্রণ?

(১) বয়সন্ধিকালে ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে ব্রণ বেশি দেখা যায়। এই সময় এন্ড্রোজেন হরমোনের পরিমাণ বেড়ে যায়, ফলে সিবেসিয়াস গ্রন্থি অতিরিক্ত তেল তৈরি করে। ত্বকের লোমকূপে থাকা কিউটিব্যাকটেরিয়াম অ্যাকনিস (Cutibacterium acnes) ব্যাকটেরিয়া সক্রিয় হয়ে ইনফেকশন ঘটায়, যার ফলে রোমকূপে পুঁজ জমে ব্রণ হয়।

(২) হরমোনের ভারসাম্যহীনতার প্রভাবে ব্রণ হতে পারে। এর মধ্যে অন্যতম হলো ইনফ্যান্টাইল অ্যাকনে, যা শিশুদের ৫-৬ মাস বয়সে দেখা যায়। বিশেষ করে পুরুষ শিশুদের মধ্যে একটি বেশি হয়। গর্ভাবস্থায় শিশুর শরীরে মায়ের হরমোনের প্রভাব থাকায় এই ব্রণ দেখা দেয়, যা সময়ের সঙ্গে কমে যায়।

(৩) দীর্ঘদিন বিভিন্ন ধরনের ওষুধ খেলে বা ব্যবহার করলে তার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় ব্রণ হতে পারে। যেমন—স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ বা ক্রিম, অবসাদের ওষুধ, প্রোজোস্টেরন পিল (বিশেষ করে পলিসিস্টিক ওভারিতে ভোগা মহিলাদের ক্ষেত্রে), টিবির ওষুধ, অতিরিক্ত ভিটামিন বি-৬ ও বি-১২ সাপ্লিমেন্ট, খিঁচুনির ও সর্দি-কাশির ওষুধ। এছাড়া অনেক কসমেটিকস পণ্যে থাকা ন্যানোলিন ও ওলিক অ্যাসিডের মতো উপাদান ত্বকের রোমকূপ বন্ধ করে ব্রণ বাড়ায়। তাই ফর্সা হওয়া বা দাগ দূর করার নামে দীর্ঘদিন কসমেটিকস, ব্যবহারে সতর্ক থাকা জরুরি।

(৪) চুলের সেরাম ব্যবহারও ব্রণর কারণ হতে পারে। বিশেষ করে খুব শুষ্ক রুক্ষ চুলকে নরম করে যে সিরাম, তাতে পোমেড জাতীয় কেমিক্যাল থাকে, যা রোমকূপগুলো বন্ধ করে ও ব্রণ সৃষ্টি হয়। একে পোমেড ব্রণও বলা হয়।

(৫) সারাদিন অনেকবার সাবান দিয়ে মুখ ধুলে তা থেকে ডিটারজেন্ট অ্যারনের প্রকোপ বাড়ে।

(৬) এছাড়া যারা কয়লা, হাইড্রো ও কার্বন কারখানায় বহুদিন ওয়েল্ডিঙের কাজ করছেন বা গ্যারেজে পেট্রোলিয়াম তেলের সংস্পর্শে কাজ করেন, তাঁদের ব্রণ হওয়ার প্রবণতা বেশি।

(৭) ব্রণ হলে অল্পবয়সিরা খোঁটাখুঁটি করতে থাকে। ফলে ত্বকে দাগ হয়ে যায়। একে অ্যাকনে এক্সকোরি বলে। তবে ডায়েট করলে ব্রণ কমে যায়, এ ধারণা ভুল। বরং হরমোনাল ব্যালান্স ঠিক না থাকায় সমস্যা আরও বাড়ে।

(৮) গর্ভকালীন হরমোনের প্রভাবে ছোটো শিশুদের মধ্যে ব্রণ দেখা দিতে পারে, যা ধীরে ধীরে সেরে যায়। যদি ৬-৮ বছর বয়সে অতিরিক্ত ব্রণ হয়, তবে অ্যান্ড্রোজেন হরমোন বেড়েছে কি না তা জানতে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে রক্ত পরীক্ষা করা উচিত।

(৯) ৮-২৫ বছর বয়সিদের মধ্যে ব্রণ হওয়া স্বাভাবিক। তবে তার পরেও ব্রণ হলে স্ট্রেস, অতিরিক্ত ওজন, সুগার, কোলেস্টেরল বা রক্তচাপ বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। হরমোনাল চিকিৎসা সত্ত্বেও যদি ব্রণ না কমে, তা হলে অবশ্যই বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

চিকিৎসা কখন, কীভাবে?

ব্রণ হলে অবহেলা না করে শুরুতেই সঠিক চিকিৎসা করলে ত্বকে দাগ বা গর্ত হয় না। ব্রণের সঙ্গে আর্থ্রাইটিস, চুল পড়া, অতিরিক্ত রোম বা তৈলাক্ত ত্বক হলে চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। যদি বড়ো আকারের ব্রণ পুঁজ, রক্ত, যন্ত্রণা বা জ্বর থাকে, তা হলে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা দরকার। ছোটো শিশুদের ক্ষেত্রে এক বছর বয়সের মধ্যে সাধারণত ব্রণের আলাদা চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না, শুধু মাইল্ড ক্লিনজার ব্যবহারেই যথেষ্ট। টিনএজার ও প্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুযায়ী অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ, মলম এবং অ্যান্টি-অ্যান্ড্রোজেন থেরাপি দেওয়া হয়। পাশাপাশি, সানক্রিন ব্যবহার বন্ধ করা, ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা, পর্যাপ্ত জলপান, ৭-৮ ঘণ্টা ঘুম এবং স্ট্রেস কমাতে যোগব্যায়াম প্রয়োজন। পিসিওএস থাকলে গাইনোকলজিস্টের পরামর্শ নিতে হবে। প্রসেসড ফুড ও ডেয়ারি (টক দই ছাড়া) পরিহার করলে এবং বেশি করে টাটকা, রঙিন শাকসবজি ও দই খেলে ব্রণ কমে যায়। এক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ফলপ্রসূ। □

নরেন্দ্র মোদী বর্তমান ভারতের প্রেরণাপুরুষ

মণীন্দ্রনাথ সাহা

প্রধানমন্ত্রী তাঁর ৭৫ বছর বয়স পূর্ণ করেছেন। এই ৭৫ বছরের জীবনপথে নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী কেবল এক রাজনৈতিক নেতা নন, তিনি এক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন দক্ষ কূটনীতিক। তাঁর সংগ্রাম, কর্মনিষ্ঠা ও দূরদর্শিতা ভারতের প্রতিটি নাগরিককে অনুপ্রাণিত করেছে। দারিদ্র্যের অন্ধকার থেকে উঠে এসে তিনি যে উচ্চতায় পৌঁছেছেন, তা প্রমাণ করে— সততা, আত্মবিশ্বাস, অদম্য উৎসাহ, পরিশ্রম ও জাতীয়তাবোধ থাকলে ইতিহাসও এক সাধারণ মানুষকে অসাধারণ করে তোলে।

এই মুহূর্তে নরেন্দ্র মোদীর জীবনের যাত্রাপথ ও কর্মপ্রবাহ বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, কীভাবে এক দরিদ্র পরিবারের সন্তান হিসেবে লড়াই করে জীবন-সংগ্রামে ধীরে ধীরে ভারতের সর্বাধিক জনপ্রিয় নেতা, সাহসী রাষ্ট্রনায়ক এবং বিশ্বনেতার অন্যতম স্তম্ভ হয়ে উঠলেন। আধ্যাত্মিকতাকে অন্তরে রেখে তিনি প্রযুক্তি, বিজ্ঞান, উন্নয়ন, কূটনীতি ও তাঁর শক্তিমান নেতৃত্বের মাধ্যমে ভারতকে বিশ্বমঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

গুজরাটের ভাদনগরের এক সাধারণ পরিবারে ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৫০ সালে জন্মগ্রহণ করেন নরেন্দ্র মোদী। আর্থিক সীমাবদ্ধতা তাঁর জীবনের শৈশবকালকে ছায়াচ্ছন্ন করলেও মনোবল ভাঙতে পারেনি। চা বিক্রি করে সংসারে সাহায্য করতে হয়েছে, কিন্তু একই সঙ্গে চলেছে শিক্ষা ও আত্মোন্নয়নের সাধনা। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের আদর্শ তাঁকে শৃঙ্খলা, কর্মনিষ্ঠা ও দেশপ্রেমের মন্ত্রে জারিত করেছে। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে (২০০১-২০১৪) তিনি 'উন্নয়নই ধর্ম' এই মূলমন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর বিখ্যাত উক্তি— 'উন্নয়ন আমার একমাত্র ধর্ম, উন্নয়নই আমার রাজনীতি।' ফলে গুজরাট ভারতের দ্রুততম উন্নত রাজ্যে পরিণত হয়। তখন থেকে তিনি সারাদেশে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে আসেন। ২০১৪ সালে তিনি যখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী হন, তখন জাতি তাঁর মধ্যে খুঁজে পায় এক কর্মক্ষম, দূরদর্শী ও সাহসী রাষ্ট্রনায়ককে।

তাঁর প্রবর্তিত প্রকল্পগুলি যেমন— জনধন যোজনা, উজ্জ্বলা যোজনা কোটি কোটি দরিদ্র মহিলার জীবনে আলো এনেছে। আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্যসেবাকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, সবকা প্রয়াস তাঁর শাসনের মূলমন্ত্রে পরিণত হয়েছে। এছাড়া স্বচ্ছভারত, জিএসটি, বেটি বাঁচাও, বিদ্যুৎ, শৌচালয়, আবাস যোজনা, মুদ্রালোন প্রভৃতি যোজনা মানুষকে স্বস্তি এনে দিয়েছে। প্রচুর পরিমাণে দেশদ্রোহী ও দেশবিরোধী শক্তি ইতিমধ্যেই চিহ্নিত হয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এই এগারো বছরে ভারত বিশ্ব ব্যাংক থেকে কোনো ঋণ নেয়নি বরং পূর্ববর্তী সরকারের করা সমস্ত ঋণ শোধ করেছে। এই এগারো বছরে অন্তত সারাবিশ্ব জানতে পেরেছে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী কে এবং তিনি কী কী কাজ করছেন।

বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের নেতৃত্বে ভারত বিশ্বকে দেখিয়ে দিয়েছে যে ভারত কীভাবে অর্থনীতি, প্রতিরক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন করেছে। এছাড়া মাওবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে। কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা অপসারণ করে নরেন্দ্র মোদী বুঝিয়ে দিয়েছেন যে এটি তাঁর

অন্যতম ঐতিহাসিক পদক্ষেপ, যা ভারতের অখণ্ডতাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে। তাঁর শাসনকালে 'নতুন ভারত' হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে দেশ। বর্তমান সরকারের প্রচেষ্টায় ২৫ কোটি ভারতীয় দারিদ্র্য সীমার উপরে উঠেছে। ভারতের জিডিপি-র উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থাগুলো ভারতের ভূয়সী প্রশংসা করেছে। মেক-ইন-ইন্ডিয়ার মাধ্যমে ভারত সরকার প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীল ও স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য দেশীয় প্রযুক্তিতে অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদন করছে। বিভিন্নরকম যুদ্ধবিমান ও মিসাইল উৎপাদন করে সফল হয়েছে। তাঁর 'অপারেশন সিঁদুর', অভিযানের সাফল্য সারাবিশ্ব প্রত্যক্ষ করেছে।

আগে ভারত প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আমদানিকারক দেশ হিসেবে চিহ্নিত ছিল, কিন্তু বর্তমানে ভারত প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম রপ্তানি করছে এবং বিশ্বের বাজারে ভারতীয় প্রতিরক্ষা পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব কিছুই সম্ভব হয়েছে নরেন্দ্র মোদীর নীতি, চিন্তা ও আত্মনির্ভর ভারত গঠনের পরিকল্পনার কারণে।

দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস্ মন্তব্য করেছিল— 'Modi has Positioned India as a Key Player on the global stage.'

দ্য গার্ডিয়ান লিখেছিল— 'Under Modi, India has become more assertive, both economically and diplomatically.'

টাইম ম্যাগাজিন তাঁকে একাধিকবার প্রচ্ছদে তুলে ধরে উল্লেখ করেছে তাঁর বিষয়ে নানা কথা, যা প্রমাণ করে, তাঁর প্রভাব কতটা গভীরে। আজ সমগ্র বিশ্ব ভারতের দিকে নতুন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সারাবিশ্ব ভারতের প্রযুক্তি, বিজ্ঞান, প্রতিরক্ষা ও অর্থনৈতিক কৌশলকে সম্মান জানাচ্ছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল থেকে শুরু করে বিশ্বব্যাংক সবাই ভারতের প্রবৃদ্ধিকে স্বীকৃতি দিয়েছে। পাকিস্তানকে প্রথমবার কূটনৈতিক ও সামরিকভাবে জবাব দিয়েছেন এবং আমেরিকার মতো মহাশক্তিধর দেশের চোখে চোখ রেখে আলোচনা করছেন। 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'-এর মন্ত্রকে তিনি বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মতো দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতার অদম্য ইচ্ছাশক্তির জোরে ভারতের নিয়তি আমূল বদলে গিয়েছে। বিশ্ববরেণ্য রাজনীতিক মোদীজী প্রতিটি আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতকে উন্নয়নের সমৃদ্ধি, সশক্তীকরণ ও একতার যুগের সঙ্গে তালে তাল মিলিয়েছে। অবিচলিত দূরদৃষ্টি, অসীম ইচ্ছাশক্তি ও দৃঢ় প্রত্যয় তাঁর রয়েছে। তাঁর অর্থনৈতিক সংস্কার থেকে শুরু করে ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরার মতো তাঁর অসামান্য অবদান লক্ষ লক্ষ মানুষকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে। নরেন্দ্র মোদীজীর অসাধারণ নেতৃত্ব ও সেবার সংকল্প দেশকে নতুন মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছে। মার্কিন গবেষণা সংস্থার মর্নিং কনসাল্টের সাম্প্রতিক সমীক্ষায় আবারও বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতার স্থানে রয়েছেন তিনি। তাঁর এই জনপ্রিয়তার কারণ হিসেবে সমীক্ষায় উঠে এসেছে দেশকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যাওয়ার সংকল্প এবং সেই অনুযায়ী কাজের রূপায়ণ।

স্বস্তিকা বাংলা নববর্ষ (১৪৩৩) সংখ্যার প্রকাশ
ও
সংস্কার ভারতীর সাংস্কৃতিক দেওয়ালপঞ্জীর লোকার্পণ

সুধী,

আগামী ১১ এপ্রিল ২০২৬, শনিবার, বিকেল ৫টা ৩০ মিনিটে স্বস্তিকা পত্রিকার বাংলা নববর্ষ সংখ্যার প্রকাশ এবং সংস্কার ভারতীর সাংস্কৃতিক দেওয়ালপঞ্জীর লোকার্পণ অনুষ্ঠান যৌথভাবে সম্পন্ন হবে কলকাতার মানিকতলা-স্থিত কেশব ভবনে।

অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করবেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা: মধুসূদন পাল এবং প্রধান বক্তারূপে উপস্থিত থাকবেন বিশিষ্ট লেখক, গবেষক তথা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র সহ-প্রচার প্রমুখ ড: জিষ্ণু বসু। অনুষ্ঠানে 'স্বস্তিকা লেখক সম্মাননা'ও প্রদান করা হবে।

অনুষ্ঠানে আপনার সবান্ধব উপস্থিতি কামনা করি।

বিনীত—

তিলক সেনগুপ্ত
সাধারণ সম্পাদক, সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ

তিলক রঞ্জন বেরা
সম্পাদক, স্বস্তিকা

১০ মিনিট আগে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে

ড. শ্যামাপ্রসাদকে লেখা কাজী নজরুল ইসলামের শেষ চিঠি

অমিত দাশ

বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম সম্পূর্ণ অসুস্থ ও নির্বাক হয়ে যাওয়ার আগে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে যে পত্রটি লিখেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের আজকের পরিস্থিতিতে তা শুধুমাত্র প্রাসঙ্গিক নয়, একজন দেশপ্রেমিক কবির পক্ষে দেশবাসীর উদ্দেশে শেষ বার্তা। বস্তুত ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আজ সশরীরে না থাকলেও তাঁরই আদর্শে গঠিত এবং পরিচালিত রাজনৈতিক দর্শনই পশ্চিমবঙ্গবাসীর জীবনে শেষরক্ষার বার্তা এনে দিতে পারে।

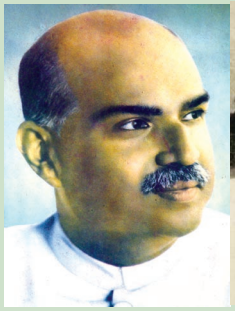

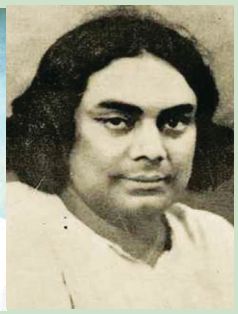

উল্লেখ্য, নজরুল কখনো শ্যামাপ্রসাদের দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন না; কিন্তু নজরুল অসুস্থ হয়ে পড়লে, তিনি যে দলের সদস্য ছিলেন সে দলের সঙ্গীরা তো বটেই, এমনকী তথাকথিত বন্ধু মুজফ্‌ফর আহমেদও নিষ্ক্রিয়তা দেখালে ড. শ্যামাপ্রসাদ এগিয়ে এসেছিলেন অসুস্থ কবি ও তাঁর পরিবারের জন্য সর্বপ্রকার সাহায্যের হাত নিয়ে। সে ইতিহাস বারান্তরে।

কৃতজ্ঞ নজরুলের নিম্নলিখিত পত্রটি আজ যথার্থই প্রাসঙ্গিক এবং অনুধাবনযোগ্য।

শ্রীচরণেষু,

আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ করুন। মধুপুরে এসে অনেক relief & relaxation অনুভব করছি। মাথার যন্ত্রণা অনেকটা কমেছে। জিহ্বার জড়ত্ব সামান্য কমেছে। আপনি এত সত্বর আমার ব্যবস্থা না করলে হয়তো কবি মধুসূদনের মতো হাসপাতালে আমার মৃত্যু হতো। আমার স্ত্রী আজ প্রায় পাঁচ বছর পঙ্গু হয়ে শয্যাগত হয়ে পড়ে আছে। এর মধ্যে মাড়োয়ারী ও কাবুলিওয়ালাদের ঋণই বেশি। হক সাহেব যখন আমার কাছে এসে কাঁদতে থাকেন যে 'আমায় রক্ষা করো, মুসলমান ছেলেরা রাস্তায় বেরুতে দিচ্ছে না,' আমি তখন মুসলিম লিগের ছাত্র তরুণদলের লিডারদের ডেকে তাদের শান্ত করি। তারপর Assembly-র সমস্ত মুসলমান মেম্বারদের কাছে আমি আবেদন করি। তাঁরা আমার আবেদন শুনলেন। ৭৪ জন মেম্বার হক সাহেবকে সমর্থন করতে রাজি হলেন। 'নবযুগে'র সম্পাদনার ভার যখন নিই, তার কিছুদিন আগে ফিল্মের Music Direction-এর জন্য সাত হাজার টাকার কন্ট্রাক্ট পাই। হক সাহেব ও তার অনেক হিন্দু-মুসলমান Supporter আমায় বলেন যে, তাঁরা ও ঋণ শোধ করে দেবেন। আমি film-এর contract cancel করে দিই। পরে যখন দু-তিন মাস তাগাদা করে টাকা পেলাম না, তখন হক সাহেবকে বললাম, 'আপনি কোনো ব্যাংক থেকে অল্প সুদে আমায় ঋণ করে দেন, আমার মাইনের অর্ধেক প্রতিমাসে কেটে রাখবেন।' হক সাহেব খুশি হয়ে বললেন, 'পনেরো দিনের মধ্যে ব্যবস্থা করব।'

তারপর সাত মাস কেটে গেল, আজ নয় কাল করে। তাঁর সমর্থকরাও উদাসীন হয়ে রইলেন। আপনি জানেন Secretariat-এ আপনার সামনে হক সাহেব বললেন, 'কাজীর ঋণ শোধ করে দিতে হবে।' আপনিও আমাকে বললেন, 'ও হয়ে যাবে।' আমি নিশ্চিন্তমনে কাজ করলাম। আপনি জানেন, হিন্দু-মুসলমান ইউনিটির জন্য আমি আজীবন কবিতায় গানে, গদ্যে দেশবাসীকে আবেদন করেছি। সে সব সাহিত্যে স্থান পেয়েছে— সে গান বাঙ্গলার হাটে, ঘাটে, পল্লীতে, নগরে নগরে গীত হয়। আমি হিন্দু-মুসলমান ছাত্র ও তরুণদের সঙ্ঘবদ্ধ করে রেখেছি, যদি হক মন্ত্রিত্ব ভেঙে যায়, তাহলে আবার Coalition Ministry-র জন্য। হক সাহেব একদিন বললেন, 'কীসের টাকা'? আমি চুপ করে চলে এলাম। তারপর আর তাঁর কাছে যাইনি। আপনি Secretariat-এ যখন বলেছিলেন, 'ও হয়ে যাবে' তখন থেকে স্থির বিশ্বাসে বসে রইলাম, 'আমি নিশ্চয়ই টাকা পাব।' এই Coalition Ministry-র একমাত্র আপনাকে অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করি, ভালোবাসি আর কাউকে না। আমি জানি, আমরাই এই ভারতবর্ষকে পূর্ণ স্বাধীন করব— সেদিন বাঙ্গালির আপনাকে ও সুভাষ বসুকেই সকলের আগে মনে পড়বে। আপনারাই হবেন এ দেশের সত্যিকার নায়ক।

আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ গ্রহণ করবেন। আমি জানি, আমি Hindu-Muslim Equity fund থেকে আমার ঋণ মুক্তির টাকা পাব। আপনার কথা কখনো মিথ্যা হবে না। পাঁচশো টাকা পেয়েছি। আরও পাঁচশো টাকা অনুগ্রহ করে যত শীঘ্র পারেন পাঠিয়ে দেবেন বা যখন মধুপুরে আসবেন নিয়ে আসবেন। কোর্টের ডিক্রির টাকা দিতে হবে। তিন চার মাস দিতে পারিনি। তাছাড়া Body Warrant বের করবে। আপনার মহত্ত্ব, আপনার আমার উপর ভালোবাসা, আপনার নির্ভীকতা, শৌর্য, সাহস আমার অণু-পরমাণুতে অন্তরে-বাহিরে মিশে রইল। আমার আনন্দিত প্রণাম পদ্মশ্রীচরণে গ্রহণ করুন।

প্রণত

কাজী নজরুল ইসলাম

তথ্যসূত্র : বামফ্রন্ট শাসনকালে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি থেকে প্রকাশিত এবং নজরুল পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রন্থ ড. অরুণকুমার বসু রচিত 'নজরুল জীবনী'।

ভারতীয় সংস্কৃতি সংবর্ধন সমিতির উদ্যোগে হিন্দু নববর্ষের স্বাগত অনুষ্ঠান

কলকাতা মহানগরের সুপ্রসিদ্ধ ও স্বনামধন্য সাংস্কৃতিক সংস্থা ভারতীয় সংস্কৃতি সংবর্ধন সমিতির উদ্যোগে গত ১৯ মার্চ কলিযুগাব্দ ৫১২৮ তথা বিক্রম সম্বৎ ২০৮৩ তথা হিন্দু নববর্ষকে স্বাগত জানানোর জন্য এক বিশাল শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। শোভাযাত্রায় বৈদিক মন্ত্রপাঠ, বর্ষবরণের গান-বাজনা, শ্রীরাম দরবার, দুর্গামাতা, শ্রীহনুমানজী, ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ, রাণাপ্রতাপ, ভারতমাতার রথ, রাজস্থানি, মরাঠি ও বাংলা নাচ-গান-সহ ট্যাবলো মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শোভাযাত্রা পাথুরিয়াঘাট স্ট্রিট, বিনানী ধর্মশালার পাশে শুরু হয়ে মালাপাড়া, কলাকার স্ট্রিট, মহাত্মা গান্ধী রোড, রবীন্দ্র সরণি, রবীন্দ্র কানন হয়ে নিমতলাঘাট স্ট্রিটে ভূতনাথ মন্দিরের পাশে ভূতনাথ ঘাটে পৌঁছয়। সেখানে নির্মল গঙ্গা চেতনা মঞ্চের উদ্যোগে ভব্য গঙ্গা আরতির পর শোভাযাত্রার সমাপ্তি হয়। বহু সংস্থা যেমন নির্মল গঙ্গা চেতনা মঞ্চ, সংস্কৃতি প্রচার সমিতি, বাল হনুমান মন্দির, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, গায়ত্রী পরিবার, শ্যাম প্রেম মণ্ডল, শাকাহার(অহিংসা পরমো ধর্ম), কাঠগোলা স্বর্ণিম ফাউন্ডেশন এবং শ্রীমৈঢ় ক্ষত্রিয় স্বর্ণকার মহিলা সমিতি শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে। প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করেন বিশিষ্ট শিল্পপতি তথা সমাজসেবী সজ্জন কুমার বনসল এবং সমাজসেবী আনন্দ গুপ্ত (ঢাকালিয়া)। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রমোদ গুপ্ত। প্রধান অতিথিরূপে ছিলেন প্রদীপ গুপ্তা। এছাড়াও বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন সত্যনারায়ণ দেওরালিয়া, বিনোদ সুলতানিয়া, সরদ সেঠ, রাজেশ সারডা, কিশন কিল্লা, নবীন সরাওগী, ডাঃ এস কে আগরওয়াল, অশোক কুমার ঢাংঢনিয়া, ২০ নং ওয়ার্ডে পার্ষদ বিজয় উপাধ্যায় এবং শ্রীমতী পূর্ণিমা চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন আয়োজন সমিতির অধ্যক্ষ বসন্ত সেঠিয়া, মন্ত্রী মনমোহন বাগড়ী, স্বাগত সমিতির অধ্যক্ষ বিকাশ ধনানিয়াঁ। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী সুভাষ মুরারকা।

গঙ্গাসাগরে ‘সন্ত প্রবাস’ অনুষ্ঠান

গত ১১ থেকে ১৮ মার্চ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে অনুষ্ঠিত হয় ‘সন্ত প্রবাস’। ১১ তারিখ গঙ্গাসাগরে সন্ত প্রবাসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আলমবাজার মঠের অধ্যক্ষ পূজ্য স্বামী সারাদাত্মানন্দজী মহারাজ, শ্রীরামকৃষ্ণ দিগ্‌দর্শন আশ্রমের সন্ন্যাসিনী সাধ্বী ক্ষণা মা, কপিল কুঠী সাংখ্য যোগ আশ্রমের অধ্যক্ষ নরোত্তমানন্দজী মহারাজ, গঙ্গাসাগর শ্রীহনুমান মন্দিরের পূজ্য মোহন্ত মাধবানন্দজী মহারাজ, গঙ্গাসাগর নিগমানন্দ সারস্বত আশ্রমের অধ্যক্ষ পূজ্য অভয়ানন্দ সরস্বতী মহারাজ, চাঁদপাড়া জগন্নাথ আশ্রমের অধ্যক্ষ ভোলানন্দজী মহারাজ, সাধ্বী সঞ্চিতা মাতাজী, সাধ্বী গৌরাঙ্গী মাতাজী, ভোলাগিরি আশ্রমের সন্ন্যাসী ধ্যানব্রতানন্দ গিরি মহারাজ এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সন্ত সম্পর্ক প্রমুখ হৃষীকেশ পাঠক। সাগর সঙ্গমে গোপূজন, তুলসী পূজন, গঙ্গা আরতি, কপিল মুনির মন্দিরে আরতি, গ্রাম সম্পর্ক ইত্যাদি কার্যক্রমের দ্বারা ‘সন্ত প্রবাস’ অনুষ্ঠিত হয়। সাধুসন্তরা সম্মিলিতভাবে সম্পাদন করেন বিশ্ব শান্তি যজ্ঞ। এই যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন ৫০০০ জন স্থানীয় মানুষ। পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে বিভিন্ন স্থানে ১৮ মার্চ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছে সন্ত প্রবাস। আগামী দিনে গোটা বর্ষ ব্যাপী ‘সন্ত প্রবাস’ অব্যাহত থাকবে বলে সাধুসন্তরা জানান।

স্বামী বিবেকানন্দের বাসভবনে 'অধ্যাপক সমর গুহ স্মরণ অনুষ্ঠান'

বিপ্লবী ও অধ্যাপক সমর গুহ ছিলেন একজন ভারতীয় সাংসদ, যিনি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান রহস্য উদ্ঘাটনের অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন এবং নেতাজী অন্তর্ধানের সঠিক তদন্তের দাবিতে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের অধিকাংশ সময় উৎসর্গ করেছিলেন। গত ২১ মার্চ উত্তর কলকাতা-স্থিত স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক আবাস ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের বিবেকানন্দ সভাগৃহে নেতাজী অনুগামীদের উদ্যোগে অধ্যাপক সমর গুহ-র প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের উদ্দেশ্যে আয়োজিত হয়— 'নেতাজীর অন্তর্ধানের প্রকৃত সত্য ভারতবর্ষের জানা দরকার'- শীর্ষক একটি আলোচনাসভা। সমবেত কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম্'-এর মধ্য দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। এরপর স্বাগত ভাষণ দান করেন অধ্যাপক সমর গুহ-র কন্যা শ্রীমতী গুহ। এরপর বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট নেতাজী গবেষক অধ্যাপক নন্দলাল চক্রবর্তী (বক্তব্যের বিষয় : 'রাশিয়া থেকে ভারত পর্যন্ত নেতাজীর যাত্রাপথ'), ডাঃ শঙ্কর কুমার চট্টোপাধ্যায় (বক্তব্যের বিষয় : লাসার জীবন্ত ঈশ্বর 'দ্য দালাই লামা'), ডাঃ মধুসূদন পাল (বক্তব্যের বিষয় : 'নেতাজী আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী ও রাজনীতিবিদ হিসেবে অধ্যাপক সমর গুহ'), সোমদেব চট্টোপাধ্যায় (বক্তব্যের বিষয় : 'নেতাজী জীবিত নাকি মৃত?' : তথ্যমূলক উপস্থাপনা), সৈকত নিয়োগী ও সৌম্যব্রত দাশগুপ্ত (বক্তব্যের বিষয় : 'নেতাজী থেকে ভগবানজী' : সুভাষচন্দ্রের অজ্ঞাতবাসের কাহিনি অনুসন্ধান)। অধ্যাপক সমর গুহ-র স্মৃতিচারণ করে ডাঃ পাল বলেন যে, সমর গুহ ছিলেন একজন বরেণ্য ভারতীয় রাজনীতিবিদ এবং ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামী। তিনি ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ঘনিষ্ঠ সহযোগী, রসায়নের অধ্যাপক এবং একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ। তাঁর রচিত রসায়নের পাঠ্যপুস্তক ছাত্রসমাজে চর্চিত ও জনপ্রিয়। ১৯৬৭ সালে তিনি পশ্চিমবঙ্গের কাঁথি কেন্দ্র থেকে চতুর্থ লোকসভায় নির্বাচিত হন। ১৯৭১ ও ১৯৭৭ সালে ওই কেন্দ্র থেকে তিনি লোকসভায় পুনর্নির্বাচিত হন। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, ১৯৪৫-এর ১৮ আগস্ট জাপান অধিকৃত ফরমোজায় (বর্তমানে তাইওয়ান) বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু হয়নি। এই বিষয়ে পেশ হওয়া শাহনওয়াজ কমিটির রিপোর্টে তিনি বিশ্বাস করেননি। সাংসদ জীবনে সমর গুহ নেতাজী সুভাষচন্দ্র সম্পর্কিত সমস্ত গোপন ফাইল প্রকাশের লক্ষ্যে আপ্রাণ প্রচেষ্টা করেছিলেন। এই ইস্যুতে ভারতীয় সংসদে তিনি বারবার সোচ্চার হয়েছেন। তদানীন্তন ভারত সরকার কোনো গোপন ফাইল প্রকাশ না করা সত্ত্বেও অধ্যাপক সমর গুহ নেতাজী অন্তর্ধানের বিষয়ে পুনরায় তদন্তের জন্য সবরকম প্রয়াস জারি রাখেন। তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ১৯৭০ সালে জিডি খোসলা কমিশন গঠিত হয়। ভারতে জরুরি অবস্থার সময় এবং তার আগের সময়কালে কংগ্রেস সরকারের জনবিরোধী নীতির প্রকাশ্যে বিরোধিতা করেছিলেন সমর গুহ। এই তীব্র বিরোধিতার কারণে ভারতে জরুরি অবস্থা জারি থাকাকালীন তিনি প্রায় দু'বছর কারাবন্দি ছিলেন। ১৯৭৭ সালের ভারতের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস সরকার পরাজিত হয় এবং অধ্যাপক সমর গুহ-সহ অনেক নেতা সক্রিয় রাজনীতিতে ফিরে আসেন। ১৯৯২ সালে নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে 'মরণোত্তর ভারতরত্ন' সম্মানে ভূষিত করতে তৎকালীন কংগ্রেস সরকার উদ্যোগ নিলে, সেই ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করতে সুপ্রিম কোর্টে নেতাজী অনুগামীদের আইনি লড়াই পরিচালনা করেন অধ্যাপক সমর গুহ ও বিপ্লবী সুনীলকৃষ্ণ গুপ্ত। আলোচনাসভায় অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে বক্তাদের প্রশ্নোত্তর পর্বের পর সকলের উদ্দেশে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ইন্দ্রাশিস ভট্টাচার্য্য। এদিনের অনুষ্ঠানটি অধ্যাপক সমর গুহ-র প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি বলে তিনি জানান। সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত 'জনগণমন'র মধ্যে দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাকের
অত্যাধুনিক গয়নার
ডিজাইনের ক্যাটালগ
সুপার
যে কোন স্বর্ণকারকে দেখাতে বলুন
ক্যাটালগের জন্য যোগাযোগ করুন
9830950831

Today's Choice.....
Vandana
SAREES • SUITS • BEDSHEETS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidory
Sarees & Bedsheets (Always Exclusive)
Cont. No. 033-2270 0476, 9432290475

হিন্দু জাগরণ মঞ্চের পরিচালনায় গীতাপাঠ ও বরাহ অবতারের পূজন

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি বঙ্গীয় হিন্দু জাগরণ, বরানগর জেলার পরিচালনায় এবং চক্ররাজ চ্যারিটেবল্ ট্রাস্ট ও শ্রী সীতারাম বৈদিক আদর্শ সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের সহযোগিতায় বরানগর অঞ্চলে পিডব্লুডি রোড-স্থিত লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির প্রাঙ্গণে আয়োজিত হয় গীতাপাঠ এবং ভগবান শ্রীবিষ্ণুর বরাহ অবতারের বিশেষ পূজন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসী স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ, শ্রীপাদ জগদার্তিহা দাস প্রভু, স্বামী সারদাত্মানন্দজী মহারাজ, শ্রীমৎ বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী মহারাজ, শ্রীমৎ নির্গুণানন্দজী মহারাজ, শ্রীসমীরেশ্বর ব্রহ্মচারী, সর্বানন্দ মহারাজ, শিবানন্দ মহারাজ, সঞ্জয় শাস্ত্রী মহারাজ, ক্ষণা মা, বিস্ময় বালক ভ্রজিষ্ণু প্রভু, শ্রীশ্রী ওঙ্কারনাথদেব বৈদিক বিদ্যাপীঠের অধিকর্তা ড. শোভন কুমার ভট্টাচার্য্য, চক্ররাজ চ্যারিটেবল্ ট্রাস্টের সম্পাদক সুদর্শন দাস, সমন্বয়কারী মৌমিতা গঙ্গোপাধ্যায় এবং শ্রী সীতারাম বৈদিক আদর্শ সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের গুরু ও শিষ্যরা। মঙ্গলাচরণ ও দীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। এরপর সাধুসন্তদের ভাষণ, বৈদিক মন্ত্র পাঠ, বরাহ ভগবানের পূজন ও হোমযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। যজ্ঞ সমাপ্ত হলে সকলে প্রসাদ গ্রহণ করেন। এরপর ভ্রজিষ্ণু প্রভুর প্রবচনের পর শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ অনুষ্ঠিত হয়। এরপর সাধু মহারাজদের বক্তৃতা ও তাঁদের সম্মান জ্ঞাপনের মধ্যে দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

সিউড়ী চাঁদনীপাড়ায় ‘শ্রদ্ধা’র শ্রদ্ধা নিবেদন অনুষ্ঠান

সিউড়ীর সামাজিক সংস্থা শ্রদ্ধা গত ২২ মার্চ ১৭১ তম শ্রদ্ধা নিবেদন করে স্থানীয় চাঁদনিপাড়ার ৮১ বছর বয়স্কা শ্রীমত্যা লক্ষ্মী ঘোষ মহোদয়াকে। তিনবার ওঙ্কারধ্বনি উচ্চারণ করে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করেন শ্রদ্ধার সম্পাদক ইন্দ্রজিৎ দাস। প্রদীপ প্রজ্বলন করেন সিউড়ী ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী বরদানন্দ মহারাজ। শ্রীমত্যা লক্ষ্মী ঘোষ মহোদয়াকে পূজা করেন তাঁর বৌমা যোগ প্রশিক্ষিকা মানসী ঘোষ। মাল্যভূষিত করেন সংস্থার অনুভবী বুলা ভট্টাচার্য। মানপত্র পাঠ করেন বিশিষ্ট সংবাদপাঠক তথা সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মিলন চট্টোপাধ্যায়। শ্রদ্ধা সংস্থার বিষয়ে আলোকপাত করেন অধ্যাপিকা চৈতালী মিশ্র। আরতি করেন শুভ্রা ঘোষ ও সুজাতা বিষ্ণু। অর্ঘ্য হিসেবে শ্রীমত্যা ঘোষকে উত্তরীয়, বস্ত্র, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ফল ও মিষ্টান্ন নিবেদন করেন সংস্থার অনুভবী কাবেরী পাল, শুভ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়, বন্দনা দাস, রমা দাশগুপ্ত, কৃষ্ণা মুখ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। মায়ের সম্পর্কে অনুভব বর্ণনা করেন শ্রীমত্যা লক্ষ্মী ঘোষের কন্যা কাকলি চট্টোপাধ্যায় এবং পুত্র শান্তনু ঘোষ। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন সংস্থার সহ সভাপতি আগমানন্দ মুখোপাধ্যায়। শেষে শান্তিমন্ত্র পাঠ করেন সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক লক্ষ্মণ বিষ্ণু। অতিথি আপ্যায়নে ছিলেন নিবেদিতা সাউ, পারমিতা দাস প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন শ্রদ্ধার সভাপতি মহাদেব মুখোপাধ্যায়, সহ সভাপতি দামোদর ঘোষাল, জগবন্ধু বন্দ্যোপাধায় প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন শিক্ষক ও সাংবাদিক পতিত পাবন বৈরাগ্য।

স্বদেশী রিসার্চ ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বিষয়ক আলোচনাচক্র

গত ২১ মার্চ মধ্য কলকাতার বিবাদী বাগ-স্থিত আশিকা সভাগৃহে স্বদেশী রিসার্চ ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় 'নেতাজী অ্যান্ড ইন্ডিয়া'স্ আনফিনিশড্ হিস্টোরিকাল কোয়েশ্চেন : প্রেজেন্ট পার্সপেক্টিভ'-শীর্ষক আলোচনাচক্র। ১৯৪৫ সালে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর রহস্যময় অন্তর্ধান ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সর্বাধিক আলোচিত অধ্যায় হিসেবে আজও বিদ্যমান। ১৯৪৫-এর পর আট দশক অতিক্রান্ত হওয়ার পরও বিমান দুর্ঘটনার বিবরণ, মহাফেজখানার নথিপত্র এবং সরকারি তদন্তসমূহকে ঘিরে উদ্ভূত প্রশ্নাবলী আজও ইতিহাস গবেষক, সাধারণ নাগরিক ও অনুসন্ধিৎসুদের কাছে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে রয়েছে। এদিনের গোলটেবিল আলোচনাচক্রে বিশিষ্ট বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ইতিহাস গবেষক চন্দ্রচূড় ঘোষ ও অনুজ ধর। এদিনের আলোচনাচক্রের উদ্দেশ্য ছিল— ঐতিহাসিক নথিপত্র পর্যালোচনা, মহাফেজখানা-লব্ধ তথ্যপ্রমাণগুলির পুনর্মূল্যায়ন এবং আগামীদিনে ভারতীয় ইতিহাস পুনর্লিখনের ক্ষেত্রে এই তথ্যপ্রমাণসমূহের বৃহত্তর প্রভাব বিষয়ক আলোচনা। পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান রহস্য সমাধানে গঠিত তদন্ত কমিশনগুলির রিপোর্টের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশ তুলে ধরা ছাড়াও বক্তারা এদিন বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করেন নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনাদর্শ। বক্তারা বিভিন্ন তথ্যপ্রমাণ উপস্থাপনের মাধ্যমে বলেন যে, ১৯৬৩ পরবর্তী পর্যায়ে নৈমিষারণ্য, বস্তী, লক্ষ্ণৌ, অযোধ্যায় অবস্থানকারী সন্ন্যাসী শ্রীশ্রীভগবানজীই হলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র।

আলোচনাচক্রে উপস্থিত ছিলেন— স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের জাতীয় সহ-আহ্বায়ক এবং স্বদেশী রিসার্চ ইনস্টিটিউটের অধিকর্তা ড. ধনপত রাম আগরওয়াল, বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 'স্বস্তিকা'র সহ-সম্পাদক সুকেশচন্দ্র মণ্ডল, হিন্দি মাসিক পত্রিকা 'স্বস্তিকা'র কার্যকরী সম্পাদক ডাঃ আনন্দ পাণ্ডে, স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের পূর্ব ক্ষেত্রীয় কার্যকর্তা অম্লান কুসুম ঘোষ, ড. সুতনু সামন্ত, স্বস্তিক শর্মা, সর্বজিৎ রায়, কমল সোমানি, সুভাষ সরাফ, প্রশান্ত সিংঘানিয়া, অশোক কুমার মাহেশ্বরী, আরকে ব্যাস প্রমুখ। দু'জন গবেষকের বক্তব্য উপস্থাপনের পর বক্তব্য রাখেন অম্লান কুসুম ঘোষ। এই ধরনের আলোচনা- চক্রের মাধ্যমে সংগঠনের কার্যকর্তারা সমৃদ্ধ হবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। আলোচনাচক্রে উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ড. ধনপত রাম আগরওয়াল। প্রায় ৩০ জন এদিনের আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণ করেছেন বলে তিনি জানান।

মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণা রোড খণ্ডে হিন্দু নববর্ষ উদ্‌যাপন। অনুষ্ঠানে ছোটোদের অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। তাতে ৪০ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। উপস্থিত ছিলেন সুকোমল দাস, খণ্ড কার্যবাহ রাজু ঘোষ। পুরস্কার বিতরণের পর সকলকে মিষ্টিমুখ করানো হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ ও নেতাজী সুভাষ স্মরণ

গত ২৫ জানুয়ারি শ্রীশ্রী ওঙ্কারনাথদেব বৈদিক বিদ্যাপীঠের উদ্যোগে উদ্‌যাপিত হয়— 'স্বামী বিবেকানন্দ ও নেতাজী সুভাষ স্মরণ'। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন অখিল ভারত জয়গুরু সম্প্রদায়ের সভাপতি কিঙ্কর বিট্‌ঠল রামানুজ মহারাজজী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাবাসাহেব আম্বেদকর এডুকেশন ইউনিভার্সিটি-র উপাচার্য ড. সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়। সারস্বত অতিথি ছিলেন শ্রী সীতারাম বৈদিক আদর্শ সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড. সোমেশ কুমার মিশ্র। অনুষ্ঠানের সম্মাননীয় অতিথি ছিলেন ইন্টারন্যাশনাল বেদান্ত সোসাইটি-র সম্পাদিকা সন্ন্যাসিনী তেজোময়ী মাতাজী ও ওই সোসাইটি-র আহ্বায়িকা বেদপ্রাণা মাতাজী। ওঙ্কারনাথ বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক ও বিদ্যার্থীদের কণ্ঠে বেদপাঠের মাধ্যমে এদিনের অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। সভাপতি ও বিশিষ্টজনেরা প্রদীপ প্রজ্বলন করেন। অতিথি বরণপর্বের পর স্বামীজী ও নেতাজী স্মরণ অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দান করেন শ্রীশ্রী ওঙ্কারনাথদেব বৈদিক বিদ্যাপীঠের অধিকর্তা ড. শোভন কুমার ভট্টাচার্য্য। এরপর বক্তব্য রাখেন রামকৃষ্ণ সারদা মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যাভবনের সংস্কৃত বিভাগের বিভাগীয় প্রধান প্রব্রাজিকা অসক্তপ্রাণা মাতাজী (বিষয় : 'নরেন শিক্ষে দেবে'— ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ) এবং আশুতোষ কলেজের অধ্যাপিকা ড. দীপা বন্দ্যোপাধ্যায় (বিষয়— নেতাজী সুভাষ : মুক্তিসূর্য এক নির্ভীক জ্যোতি)। সঙ্গীতাঞ্জলী উপস্থাপন করেন বঙ্গীয় সনাতনী সংস্কৃতি পরিষদের সদস্যা অদিতি রায়। অনুষ্ঠানের শেষে সকলের উদ্দেশে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শ্রীশ্রী ওঙ্কারনাথদেব বৈদিক বিদ্যাপীঠের কার্যকরী সভাপতি তাপস দত্ত। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন সাধন চন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক শুভদীপ মুখোপাধ্যায় এবং আকাশবাণী, কলকাতা-র সংবাদ উপস্থাপক প্রবীর ভট্টাচার্য্য।

গত ১৯ মার্চ বর্ষপ্রতিপদ উপলক্ষ্যে মালদহ জেলা রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি সুসজ্জিত শোভাযাত্রা-সহ পথসঞ্চলনের আয়োজন করে। জেলার বিভিন্ন শাখা থেকে শতাধিক সেবিকা এই পথসঞ্চলনে অংশগ্রহণ করেন। শহরের পথচলতি মানুষ এই পথসঞ্চলন দেখতে স্থানে স্থানে ভিড় করেন। সুষ্ঠুভাবে পথসঞ্চলন সম্পন্ন করার জন্য মালদা নগরের স্বংসেবকরা সব রকমের সহযোগিতা করেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকেও সব রকমের সহযোগিতা পাওয়া যায়।

হারানো পত্রিকা— সাত

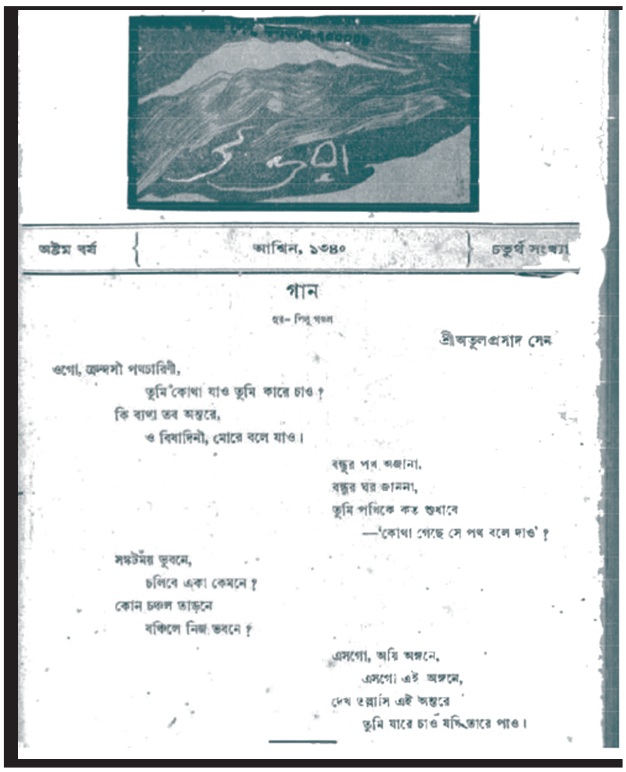

উত্তরা

অষ্টম বর্ষ { আশ্বিন, ১৩৪০ } চতুর্থ সংখ্যা

গান

সুর- পিলু গজল

শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন

ওগো, ক্রন্দসী পথচারিণী,
তুমি কোথা যাও তুমি কারে চাও ?
কি ব্যথা তব অন্তরে,
ও বিষাদিনী, মোরে বলে যাও।

বন্ধুর পথ অজানা,
বন্ধুর ঘর জাননা,
তুমি পথিকে কত শুধাবে
—'কোথা গেছে সে পথ বলে দাও' ?

সঙ্কটময় ভুবনে,
চলিবে একা কেমনে ?
কোন চঞ্চল তাড়নে
বধিলে নিজ ভবনে ?

এসগো, অয়ি অঙ্গনে,
এসগো এই অঙ্গনে,
দেখ উল্লাসি এই অন্তরে
তুমি যারে চাও যদি তারে পাও।

অতুলপ্রসাদের মানসসন্তান উত্তরা

নন্দলাল ভট্টাচার্য

লেখক ও পাঠকের হৃদয়ের মিলনেই সার্থক হয়ে ওঠে সাহিত্য। এই মেলবন্ধনে অনুঘটকের কাজ করে সাময়িক পত্রপত্রিকাগুলি। সবদেশেই। ব্যতিক্রম নয় বঙ্গদেশও। এমন ঘটনা ঘটে চলেছে পত্রপত্রিকার আবির্ভাবের সেই প্রথম লগ্ন থেকেই। স্বভাবতই সাহিত্যের ইতিহাসের অন্যতম উপাদান হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে সাময়িক পত্রপত্রিকা। সেই কারণেই তাই এই পত্রপত্রিকাগুলির ইতিহাস জানাটা খুবই জরুরি।

বঙ্গদেশে সেকালে ও একালেও বেশিরভাগ পত্রপত্রিকাই কলকাতা কেন্দ্রিক। কলকাতার কাগজে লেখা প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত লেখকের স্বীকৃতিও প্রায়ই মেলে না। তাই কলকাতা কেন্দ্রিক পত্রিকাগুলিই থাকে মূলত আলোচনার কেন্দ্রে।

অথচ একথাও সত্য, মফস্‌সলে বা জেলাগুলি থেকেও পত্রপত্রিকা বের হচ্ছে সাময়িক পত্রের যাত্রা শুরুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। সেসব পত্রপত্রিকার অনেকগুলিই নানা কারণে অভিনবত্বের দাবি রাখে।

এই সঙ্গে স্মরণে রাখা দরকার, বাংলা পত্রপত্রিকার উদ্ভবক্ষেত্র আবদ্ধ থাকেনি কেবল বঙ্গদেশের সীমার মধ্যেই। বঙ্গদেশের বাইরে বিশেষ করে উত্তর ভারতের প্রবাসীরা প্রাণের টানেই সাহিত্যচর্চার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন। নেহাত শখ মেটাতে নয়, এজাতীয় পত্রিকার অনেকগুলিই নানাভাবে বাংলা সাহিত্যকে পুষ্ট করেছে অভিনবত্বের রকমারি সম্ভারে। এইসব পত্রিকার বহু লেখকই বাংলা সাহিত্যের প্রাণপ্রবাহে এনেছেন গতি।

প্রবাসের ওইসব পত্রপত্রিকার মধ্যে লক্ষ্ণৌ ও কাশী বা বারাণসী থেকে প্রকাশিত মাসিক 'উত্তরা' বর্ণালি সাহিত্য সৃজনে সামগ্রিক ভাবে বাংলা সাহিত্যের আকাশকে রাঙিয়ে তোলে গভীরভাবে। সে কারণেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা বা রচনার সময় কোনো ভাবেই উপেক্ষা করা যায় না 'উত্তরা'-কে। মহত্তর কীর্তির কাঞ্চন-মহিমায় 'উত্তরা' আজও একটি গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা হিসেবেই চর্চিত।

'উত্তরা'র জন্মদাতা হিসেবে অবশ্যই চিহ্নিত করতে হয় বাংলা সাহিত্যের মরমি কবি অতুল প্রসাদ সেন (১৮৭১-১৯৩৪) এবং আজীবন প্রবাসী বাংলা সাহিত্যসেবী সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্তীকে (১৯০১-১৯৭৩)। প্রসঙ্গত, সাহিত্য ক্ষেত্রে 'চন্দ্র'-র ভার বহনে অরাজি হওয়ার কারণে সুরেশ চক্রবর্তী নামেই সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি পরিচিত।

বয়সে ত্রিশ বছরের ছোটো সুরেশ চক্রবর্তী পরিচয়ের দিন থেকেই অতুল প্রসাদকে বসিয়েছেন অগ্রজের আসনে। অতুল প্রসাদও তাঁকে স্নেহ করতেন অনুজের মতোই। এক ধরনের আত্মিক বন্ধনে আবদ্ধ সুরেশ চক্রবর্তী সাহিত্যচর্চা ছাড়াও অতুলপ্রসাদের বহু কাজেরই ভার সাগ্রহে বহন করেছেন। বিশেষ করে অতুলপ্রসাদের মানসসন্তান 'উত্তরা'র প্রকাশ ও সম্পাদনার সব দায়িত্বই একা বহন করেছেন সুরেশ চক্রবর্তী। আর সেসব কারণেই সুরেশ চক্রবর্তী নিজের অসুবিধা সত্ত্বেও অতুল প্রসাদকে 'উত্তরা'র আর্থিক দায়িত্ব থেকে

মুক্তি দেবার জন্য চেষ্টা করেন। অতুলপ্রসাদও সেই কারণে ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে সুরেশ চক্রবর্তীকেই 'উত্তরা'-র সম্পাদক পদে বরণ করেন।

'উত্তরা'-র প্রাণপুরুষ অতুলপ্রসাদ লন্ডন থেকে ব্যারিস্টার হয়ে ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় এসে আইনব্যবসা শুরু করেন। কিন্তু এক পারিবারিক সংকটের জন্য তিনি লক্ষ্ণৌবাসী হন। সেখানে ব্যারিস্টারি করার সঙ্গে সঙ্গে নানারকম সামাজিক-সাংস্কৃতিক কাজকর্মের সঙ্গেও জড়িয়ে পড়েন। বিশেষ করে তিনি বাংলা সাহিত্যচর্চার মধ্যমণি হয়ে ওঠেন। তাঁরই কর্মতৎপরতায় গঠিত হয় 'উত্তর ভারতীয় বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন'। তিন বছর পর ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্ণৌয়ে তৃতীয় অধিবেশনে এই সম্মেলনের নতুন নাম হয় 'প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন'। এই অধিবেশনেই অতুলপ্রসাদ সম্মেলনের একটি মুখপত্র প্রকাশের প্রস্তাব দেন। শুধু তাই নয়, প্রস্তাবিত পত্রিকার নাম 'উত্তরা' রাখার কথাও বলেন তিনি।

ওই অধিবেশনেই পত্রিকা প্রকাশের জন্য একটি সমিতিও গঠন করা হয়। এগারো সদস্যের ওই সমিতির নেতৃত্বে ছিলেন অতুলপ্রসাদ। একইসঙ্গে পত্রিকার জন্য একটি উপদেষ্টা সমিতিও গঠিত হয়। সমিতিতে ছিলেন সরলাদেবী চৌধুরানী, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, পোপীনাথ কবিরাজ ও মেঘনাদ সাহা।

'উত্তরা' মাসিক পত্রিকার যুগ্মসম্পাদক হন অতুলপ্রসাদ এবং রাধাকমল মুখোপাধ্যায়। সহ-সম্পাদক হন সুরেশ চক্রবর্তী। অতুলপ্রসাদ ও রাধাকমল সম্পাদক হলেও পত্রিকার প্রকৃত প্রাণশক্তি ছিলেন সুরেশ চক্রবর্তী। সম্পাদক থেকে প্রকাশনার সব দায়িত্বই বহন করতেন তিনি একাই।

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন মুখপত্র হিসেবে 'উত্তরা'-র প্রকাশনার প্রস্তাব গ্রহণ করে সিদ্ধান্ত নেয়, এক হাজার টাকা এবং পাঁচশো গ্রাহক সংগ্রহের পর পত্রিকাটি প্রকাশিত হবে। ওই সম্মেলনেই অনেকে ব্যক্তিগত ভাবে অর্থদানের প্রতিশ্রুতি দেন। একই সঙ্গে লক্ষ্ণৌ, বারাণসী, প্রয়াগ, কানপুর ইত্যাদি জায়গার শাখাকেন্দ্র থেকেও একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের অর্থ দেওয়ার কথা বলা হয়। সব মিলিয়ে বিরাট উদ্দীপনার মধ্যে শেষ হয় সম্মেলনের অধিবেশন। সেই সঙ্গে পত্রিকা প্রকাশ নিয়েও অনেক কথার ফানুস ওড়ানো হয়। বাস্তবে কিন্তু অবস্থাটা তেমন অনুকূল হলো না। সামান্য কিছু অর্থ সংগৃহীত হলেও অনেকেই কথা রাখেননি। অন্যদিকে, গ্রাহক সংগ্রহের ব্যাপারেও তেমন উৎসাহ দেখা যায়নি। ফলে পত্রিকার সব দায়িত্বই নিতে হয় অতুলপ্রসাদকে। এ ব্যাপারে সুরেশ চক্রবর্তীকে এক চিঠিতে অতুলপ্রসাদ লেখেন, 'কাগজটা যদি আমার নিজের হইত— সম্মিলনীর মুখপত্র না হইত তবে নিজের দায়িত্বেই সব কাজ করিতাম।'

অতুলপ্রসাদ সবসময়ই গণতান্ত্রিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন। নিজে সব আর্থিক ও অন্যান্য দায়দায়িত্ব বহন করলেও কখনোই নিজের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতেন না। সকলের মতামত নিয়ে কাজ করাই পছন্দ করতেন তিনি। সে কারণেই 'উত্তরা'-র আত্মপ্রকাশে কিছুটা সময় লাগে।

অতুলপ্রসাদের কথাতেই সুরেশ চক্রবর্তী কাশী থেকে লক্ষ্ণৌ এসে রাধাকমল ও রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এবং অন্যান্যদের সঙ্গে পত্রিকা নিয়ে কথাবার্তা বলেন। ঠিক হয় 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে' পত্রিকা প্রকাশিত হবে। সেই মতো শুরু হয়ে যায় কাজও।

অতুলপ্রসাদের আর্থিক সহযোগিতায় সুরেশ চক্রবর্তী প্রায় একাই পত্রিকা প্রকাশের জন্য ছোটাছুটি করতে থাকেন। কিন্তু দেখা গেল, প্রকাশ্যে নানাজন প্রতিশ্রুতি দিলেও প্রায় সকলেই কার্যক্ষেত্রে কেমন যেন নীরব। নানা ধানাইপানাই করে প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যান প্রায় সকলেই।

এরকম একটা অবস্থায় হাল ধরতে হয় অতুলপ্রসাদ ও সুরেশ চক্রবর্তীকেই। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমে অবশেষে 'উত্তরা' জনসমক্ষে আসে ১৩৩২ বঙ্গাব্দের আশ্বিনে মহালয়ার পুণ্য প্রভাতে। রয়াল সাইজের পত্রিকাটি অসিত কুমার হালদারের আঁকা তিন রঙের প্রচ্ছদে চিত্রিত। পত্রিকাটির দাম ছিল সডাক বার্ষিক তিন টাকা চার আনা, প্রতি সংখ্যা চার আনা। পরে পত্রিকাটির সডাক বার্ষিক মূল্য হয় চারটাকা এবং মাসিক সাঁইত্রিশ পয়সা।

'উত্তরা'-র আবির্ভাবে আলোড়ন উঠল সারা বঙ্গেই। প্রথম সংখ্যা হাতে পেয়েই রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, 'উত্তরা উত্তম হইয়াছে।' একই ভাবে 'কল্লোল' পত্রিকার জন্মলগ্ন থেকেই তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রাণের সবটুকু উত্তাপ মিশিয়ে সুরেশ চক্রবর্তীকে এক চিঠিতে লিখলেন, 'প্রথম সংখ্যা পড়ে ভারি খুশি হয়েছি। সবক'টি লেখাই ভারি সুন্দর। বাঙ্গলার কোনো কাগজই একে প্রবন্ধ-সম্পদে ছাড়িয়ে যেতে পারবে না...'।

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের এই মন্তব্য মামুলি সৌজন্যমূলক কিছু কথা নয়। এটা ছিল একটা মূল্যায়ন। প্রকৃতপক্ষে কলকাতা থেকে বেশ কয়েকশো কিলোমিটার দূরবর্তী উত্তরপ্রদেশের বারাণসী ও লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত 'উত্তরা' রচনাসম্ভার ও মুদ্রণ পরিপাট্যে অনেককেই টেক্কা দিয়েছিল।

মাসিক 'উত্তরা'-র প্রথম সংখ্যাতেই ছিল রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী— 'বঙ্গের দিগন্ত ছেয়ে বাণীর বাদল/বহে যায় শতস্রোতে রসবন্যাবেগে...'। ছিল ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, গোপীনাথ কবিরাজ, সত্যেন্দ্রনাথ রায়, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, সরলা দেবী চৌধুরানী প্রমুখের প্রবন্ধ; রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের মুখবন্ধ; অতুলপ্রসাদের কথা ও সুরে গান এবং তার স্বরলিপি। বিখ্যাত চিত্রশিল্পী অসিতকুমার হালদারের আঁকা তিনরঙা প্রচ্ছদে শোভিত 'উত্তরা'-র প্রথম সংখ্যাতেই পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়, 'এই প্রকাশের পশ্চাতে আপনাদের যে সাহায্য ও শুভ ইচ্ছা রহিয়াছে কেবল তাহাই প্রবাসী বাঙ্গালির এই অনুষ্ঠানটিকে উদ্দেশ্য পথে অগ্রসর করিয়া দিতে সমর্থ।'

'উত্তরা'-র প্রথম সংখ্যা থেকেই প্রচ্ছদের উপরে লেখা থাকত, 'প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের মুখপত্র : উত্তরা।' সপ্তম বর্ষে পত্রিকার সম্পাদক হন সুরেশ চক্রবর্তী। সেই সময় থেকে প্রচ্ছদের ওই বাক্যটির পরিবর্তে লেখা হতে থাকে, 'বাঙ্গলার বাহিরে বাঙ্গালি প্রতিষ্ঠিত একমাত্র সচিত্র মাসিক পত্রিকা।'

সম্মিলনীর মুখপত্র হওয়া সত্ত্বেও পত্রিকাটির ব্যয়ভার অতুলপ্রসাদকেই বহন করতে হচ্ছিল। সম্মিলনীর পক্ষ থেকে সহযোগিতাও তেমন মিলছিল না। বিষয়টা একসময় তাঁর কাছে খুবই অস্বস্তিকর এবং অসহনীয় হয়ে ওঠে।

অতুলপ্রসাদ ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের ১ মে লক্ষ্ণৌ থেকে একটি চিঠি লেখেন সুরেশ চক্রবর্তীকে— '...'উত্তরা'র জন্য আমাকে খুব ক্ষতিগ্রস্ত হতে হচ্ছে; যদি জানিতাম আমার উপরই সমস্ত দায়িত্ব ফেলিবে তাহলে একাজে হস্তক্ষেপ করিতাম না। ...ভবিষ্যতে তুমি যে শর্তে কাগজখানি আগামী আশ্বিন পর্যন্ত চালাইতে প্রতিশ্রুত হইয়াছ ঠিক সেরূপ ভাবে কাজ করিবে।'

শর্তগুলি ঠিক কী ছিল তা জানা যায়নি। তবে ওই সময় থেকেই সুরেশ চক্রবর্তী পত্রিকার অর্থনৈতিক দায়দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন। কলকাতা বা বারাণসীর প্রেসে কাগজ ছাপার খরচ অনেক বেশি। তাই খরচ কমানোর জন্য তিনি কাশীতেই 'উত্তরা'-র নিজস্ব ছাপাখানাটি প্রতিষ্ঠা করেন।

'উত্তরা'-র যাত্রা শুরু ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে। প্রথম দিকে পত্রিকার প্রকাশ ছিল কিছুটা অনিয়মিত। কিছুদিন পরেই অবশ্য এই দুর্বলতা কাটিয়ে টানা একচল্লিশ বছর চলার পর ১৯৬৬-তে চিরতরে থেমে যায় 'উত্তরা'-র যাত্রা। সাধারণভাবে বাঙ্গলার সাময়িক পত্রিকাগুলির বেশিরভাগই স্বল্পায়ু। সেক্ষেত্রে কলকাতা থেকে বহু দূরে একটি অতি উচ্চমানের পত্রিকার এই জীবনকাল অবশ্যই অত্যন্ত শ্লাঘার বিষয়।

'সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই'— তাদেরই একজন সুরেশ চক্রবর্তী। মানুষটি বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে ভালোবেসে জীবনভর প্রত্যাশাহীন, অক্লান্ত কর্মী ও সৈনিক হিসেবে জীবনের সর্বস্ব দিয়েছেন 'উত্তরা'-র জন্য। কলকাতা থেকে বহু দূরে থেকেও মূলধারার সাহিত্যকে সেবা বা ঋদ্ধ করার এমন নিদর্শন খুব কমই আছে।

সুরেশ চক্রবর্তী আজীবন বারাণসীবাসী। কিন্তু কলকাতার সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে ছিল তাঁর যেন এক ধরনের নাড়ির টান। ১৩৩০ বঙ্গাব্দে বছর বাইশ বয়সে কাশীতে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন মাসিক 'অলকা'। তিনি ছিলেন পত্রিকার সহ-সম্পাদক। তবে সাংবাদিকতা বা সাহিত্যে তাঁর হাতেখড়ি কাশীতে কবি ও নাট্যকার মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রবাসজ্যোতি' পত্রিকায় (১৩২৭ সালে প্রতিষ্ঠিত)। এরপরে ১৩৩০ বঙ্গাব্দে তিনি নিজেই কাশী থেকে প্রকাশ করেন পাক্ষিক 'প্রবাসী বাঙ্গালি'। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তিনি। সেখান থেকেই হন 'উত্তরা'র সহ-সম্পাদক।

সাহিত্য ও সাংবাদিকতায় নিবেদিতপ্রাণ সুরেশ চক্রবর্তী নিজে লিখেছেন কম। সম্পাদনাতেই ছিল বেশি আগ্রহ। তাঁর লেখা গ্রন্থের তালিকায় আছে— রহমান খাঁর দুর্গোৎসব, মানসী, মধূপ প্রভৃতি। তাঁরই সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'অতুলপ্রসাদ সেন'।

মূলত কাশীবাসী হলেও কলকাতার সাহিত্য জগতের সঙ্গে ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। 'উত্তরা'-র বছর দুই আগে ১৯২৩-এ প্রকাশিত 'কল্লোল' পত্রিকার অনেকেই ছিলেন তাঁর বন্ধুস্থানীয়। 'উত্তরা'-র সম্পাদনার সময় অতুলপ্রসাদ ও সুরেশ চক্রবর্তী দু'জনেই 'কল্লোল'-এর নতুন ধারার আধুনিক সাহিত্যের প্রতি তাঁদের সমর্থন জানান। শুধু তাই নয়, 'কল্লোল'-এর নবীন লেখক গোষ্ঠীর বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, শৈলজারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ছিলেন 'উত্তরা'-র প্রায় নিয়মিত লেখক।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন 'উত্তরা'-র শুভানুধ্যায়ী এবং ওই পত্রিকার প্রায় নিয়মিত লেখক। কিন্তু 'কল্লোল'-এর প্রতি 'উত্তরা'-র সমর্থন নিয়েই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সম্পর্কে একবার বড়ো ধরনের ফাটল ধরে। ঘটনাটা ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের। সেসময় 'উত্তরা'-য় ধারাবাহিকভাবে বের হচ্ছিল 'জাভাযাত্রীর ডায়েরী'। ওই সময়ই 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'সাহিত্য ধর্ম'। আধুনিক সাহিত্যের সমালোচনা ছিল ওই প্রবন্ধে। এই নিয়ে শুরু হয় তীব্র বিতর্ক। 'উত্তরা' ছিল আধুনিক সাহিত্যের সমর্থক। তাই পত্রিকায় প্রকাশিত হয় একাধিক প্রতিবাদ রচনা।

রবীন্দ্রনাথ সেসময় ছিলেন মালয় দেশে। তিনি ফিরে এলে তাঁর কয়েকজন অনুরাগী জানান, 'উত্তরা'-য় 'সাহিত্যের ধর্ম' প্রবন্ধের বিরুদ্ধে প্রকাশিত হচ্ছে নানা গরম গরম রচনা। সব শুনে ক্ষুণ্ণ রবীন্দ্রনাথ 'উত্তরা'-য় তাঁর 'জাভাযাত্রীর ডায়েরী' প্রকাশ বন্ধ করতে বলে অতুলপ্রসাদ ও সুরেশ চক্রবর্তীকে চিঠি দেন।

অতুলপ্রসাদ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের অতি ঘনিষ্ঠ। তবুও এক্ষেত্রে নিরপেক্ষ থাকেন। সম্পাদকের অধিকার নিয়ে তিনি 'উত্তরা'-র কাজে কখনো হস্তক্ষেপ করেননি। পরে অবশ্য রবীন্দ্রনাথ ব্যাপারটা বুঝতে পারেন। 'উত্তরা'-য় আবার প্রকাশিত হতে থাকে রবীন্দ্রনাথের লেখা।

ওই সময়েই 'উত্তরা'-র বিরুদ্ধে অশ্লীল রচনা প্রকাশের অভিযোগ করে কিছু লেখক আদালতে মামলা করেন। মামলায় জড়িয়ে পড়েন অতুলপ্রসাদ, রাধাকমল ও সুরেশ চক্রবর্তীও। পরে অবশ্য মিটে যায় ওই মামলা।

একচল্লিশ বছরের জীবনে 'উত্তরা' প্রকাশ করে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচি, হেমেন্দ্র কুমার রায়, জগদীশ গুপ্ত, নজরুল, প্রমথ চৌধুরী, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, বনফুল, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, অতুল গুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, আবদুল ওদুদ, প্রবোধ সান্যাল, বিনয় সরকার, কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, সুধীন দত্ত, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, আশাপূর্ণা দেবী, রাধারানি দেবী, আশালতা দেবী, নিরুপমা দেবী প্রমুখের লেখা। এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয় প্রমোদ কুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ' এবং তাঁরই আঁকা ছবি।

'উত্তরা'-র পাতায় নিয়মিত প্রকাশিত হতো অবনীন্দ্রনাথ, সারদা উকিল, যামিনী গঙ্গোপাধ্যায়, হেমেন মজুমদার, অসিত হালদারের মতো বিশিষ্ট শিল্পীদের আঁকা রঙিন ছবি।

একই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, অবনীন্দ্রনাথ, কেদারনাথ প্রভৃতি বিশেষ সংখ্যাগুলি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হিসেবে আজও চিহ্নিত।

সব মিলিয়ে বহির্বঙ্গ থেকে প্রকাশিত 'উত্তরা' বাংলা সাময়িক পত্রের অভিযাত্রায় এক সংগ্রামী কাণ্ডারি হিসেবে আজও স্মরণীয়। □

অকালবোধন ও বাসন্তী পূজা

সুস্মিতা সেন

আশ্বিনের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে অনুষ্ঠিত দেবী দুর্গার আরাধনাকে 'অকালবোধন' বলা হয়। 'অকাল' মানে অসময় বা অনুপযুক্ত কাল। বাল্মীকি রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের এই পূজার উল্লেখ নেই। তবে কৃত্তিবাস ওঝা সবিস্তারে লিখেছেন অকালবোধনের কথা। এছাড়া দেবী ভাগবত পুরাণ ও কালিকাপুরাণে রয়েছে এর উল্লেখ। কালিকা পুরাণ ও বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ অনুসারে, ভগবান শ্রীরামচন্দ্র শরৎকালে, দেবী দুর্গাকে প্রসন্ন করে তাঁর জাগরণ করিয়ে আশীর্বাদ লাভের জন্য একশো আটটি নীল পদ্ম দিয়ে তাঁর পূজা করেছিলেন। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, শ্রীরামচন্দ্র মহাবলশালী অত্যাচারী রাবণকে বধ করার জন্য এবং দেবীর কৃপা লাভের জন্য শরৎকালের আশ্বিন মাসে দেবী দুর্গার আরাধনা করেছিলেন যাতে যুদ্ধে রাবণকে পরাজিত করতে পারেন। রামায়ণ অনুসারে, ব্রহ্মা শ্রীরামকে শরৎকালে দেবী দুর্গার পূজা করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে, শরৎকাল দেবপূজার শুদ্ধ সময় নয়, কারণ এই সময়টি দেবতাদের নিদ্রার সময়। শরৎকালে দেবী দুর্গার পূজা তাই 'অকালবোধন' নামে পরিচিত। অকালবোধনে বিশেষত যে রূপে দেবী দুর্গার পূজা করা হয় সেটা দুর্গতিনাশিনী বা মহিষাসুরমর্দিনীর রূপ। এই বিশেষ পূজা শুধু দেবীর জাগরণ নয়, বরং দেবীর আশীর্বাদ লাভ করার একটি গুরুত্বপূর্ণ রীতি।

মূলত এই অকালবোধনকালে দেবীর আরও ৯টি রূপের পূজা করা হয় যা নবরাত্রি ব্রত নামে পরিচিত। নবদুর্গার নয়টি রূপ— শৈলপুত্রী, ব্রহ্মচারিণী, চন্দ্রঘণ্টা, কুষ্মাণ্ডা, স্কন্দমাতা, কাত্যায়নী, কালরাত্রি, মহাগৌরী ও সিদ্ধিদাত্রী। পুরাণে প্রত্যেকটি দেবীরই নিজস্ব বিশেষ তাৎপর্য ও গুরুত্ব রয়েছে।

শৈলপুত্রী— পর্বতের কন্যা রূপে পূজিত হন।

ব্রহ্মচারিণী— ব্রহ্মের পথ অনুসরণকারী দেবী।

চন্দ্রঘণ্টা— দেবীর মাথায় ঘণ্টার মতো আকারের চাঁদ থাকে।

কুষ্মাণ্ডা— মহাজাগতিক ডিম্ব সৃষ্টি করেছেন যিনি।

স্কন্দমাতা— কার্তিক বা স্কন্দের মা হিসেবে পরিচিত।

কাত্যায়নী— ঋষি কাত্যায়নের কন্যা রূপে জন্মগ্রহণ করেছেন।

কালরাত্রি— অন্ধকারের দেবী এবং মহাদেবী দুর্গার উগ্র রূপের অংশ।

মহাগৌরী— শুদ্ধ ও পবিত্রতার দেবী।

সিদ্ধিদাত্রী— মোক্ষ ও সিদ্ধি দান করেন যিনি।

বসন্তকালে, চৈত্রমাসে অনুষ্ঠিত হয় বাসন্তী পূজা (চৈত্র-বৈশাখ)। প্রাচীনকাল থেকেই বসন্তকালে অনুষ্ঠিত 'বাসন্তীপূজা' চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে হয়। এই সময়ের দেবী রূপকেই 'বাসন্তী দুর্গা' বলা হয়। বাসন্তী পূজাই প্রকৃত দুর্গাপূজা। মা দুর্গার 'বাসন্তী' রূপের উৎপত্তি ও প্রচলন মূলত ঋতু ও পূজার সময়ের সঙ্গে জড়িত। বসন্তকালকে নবজাগরণের ঋতু বলা হয়, যেখানে প্রকৃতি নতুন করে প্রাণ ফিরে পায়। এই সময় প্রকৃতির সঙ্গে শক্তির প্রতীক দেবী দুর্গার পূজা প্রাচীনকালে খুব প্রচলিত ছিল।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিত আছে যে, রাজা সুরথ তাঁর রাজ্য হারিয়ে মেধস মুনির আশ্রমে আসেন। সেখানে সমাধি বৈশ্যও আসেন। তাঁরা মেধস মুনির কাছে জানতে পারেন যে, দেবী দুর্গা চৈত্র মাসে পূজিত হলে বিশেষভাবে প্রসন্ন হন। এই জ্ঞান লাভের পর তারা বসন্তকালে দেবী দুর্গার পূজা করেন। এটি বাসন্তী পূজার প্রথম প্রচলন বলে মনে করা হয়। বাসন্তী পূজা মূলত চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী বা নবমীতে বিশেষভাবে উদ্‌যাপিত হয়। এই পূজার একটি বৈশিষ্ট্য হলো, এই দিন পূজাতে 'বিল্ব বরণী' বা 'বিল্বাধিবাস' অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় যেখানে ষষ্ঠী পূজার সঙ্গে একটি বেল গাছের পূজা করা হয়। পূজার অষ্টমী তিথিতে দেবী অন্নপূর্ণার আরাধনার রীতি। দেবী অন্নপূর্ণাও দেবী দুর্গারই এক রূপ। বাসন্তী দুর্গার রূপ বৈশিষ্ট্য সাধারণত সতী, গৌরী, অন্নপূর্ণা ও শক্তিদায়িনী দুর্গা হিসেবে কল্পনা করা হয়।

ঐতিহ্যগতভাবে দুর্গাপূজা বসন্তকালে অনুষ্ঠিত হতো যা বাসন্তী পূজা এবং অন্নপূর্ণা পূজা হিসেবে আজও অনুষ্ঠিত হয়। এটি তুলনামূলকভাবে এখন ছোটো এবং কিছু নির্দিষ্ট পরিসরে পালিত হয়, যা অনেক ক্ষেত্রে পারিবারিকভাবে হয়। বাসন্তী দুর্গা মূলত দেবীর এক রূপ, যা বসন্তকালে পূজিত হন। এটি একদিকে যেমন প্রকৃতির নবজাগরণের প্রতীক, তেমনি আধ্যাত্মিক জাগরণেরও প্রতিফলন।

কিন্তু শ্রীরামের পূজার কারণে শরৎকালে দুর্গাপূজা 'অকালবোধন' নামে পরিচিত হয় যা পরবর্তীকালে বাঙ্গালির প্রধান দুর্গাপূজা হিসেবে গণ্য করা হয়। যেহেতু শরৎকালের অকালবোধন দেবীর দুর্গতিনাশিনী রূপের সঙ্গে জড়িত, তাই এটি মূলত মহিষাসুরমর্দিনী বা দুর্গাপূজা নামে পরিচিত। দেবীর এই রূপের পূজা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে দেবীর আশীর্বাদ লাভের জন্য এবং পরবর্তীকালে বাঙ্গালির 'শারদীয়া দুর্গাপূজা' নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। 'শারদীয়া দুর্গা পূজা' জনপ্রিয় হয়ে উঠলেও 'বাসন্তী দুর্গা পূজা' পারিবারিক সূত্রে কিছু স্থানে এখনো প্রচলিত রয়েছে।□

পরিবর্তনের এক সুবর্ণ সুযোগ বাঙালির সামনে

রবিশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

'পশ্চাৎ-পথ-যাত্রীর মনে সন্দেহ জাগে আজ!
কাণ্ডারি! তুমি ভুলিবে কি পথ? ত্যজিবে কি পথ-মাঝ?'
—কাজী নজরুল

যজ্ঞের সমস্ত উপকরণ প্রস্তুত, মাঝে কয়েকটি ঘণ্টা,তারপর পশ্চিমবঙ্গবাসীর জন্য কোন শুভ বার্তা বহন করে নিয়ে আসছে তা অজানা। আদৌ দেশের অখণ্ডতা, ধর্ম নিরপেক্ষতা,সার্বভৌমত্ব গণতন্ত্র অবিকৃত থাকবে না কি অভিমুখ বদলাবে পাপচক্রে, এ এক কঠিন অগ্নিপরীক্ষা। সম্মুখ সমরে চূড়ান্ত প্রস্তুত যুযুধান শাসক-বিরোধী দুই শিবিরই। অখ্যাতীর বিড়ম্বনায় চরম বিশ্বাসযোগ্যতার মহামারীর সংকট অত্যন্ত প্রকট মনে হলো শাসক শিবিরের পূর্বাকাশে, গ্রহণযোগ্যতাও হাজারো প্রশ্নের মাঝখানে। এক অদ্ভুত বিড়ম্বনা যেন বিষন্নতায় ঢেকে ফেলেছে শাসক শিবিরকে। রুপোলি জগৎ মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে, ছাত্র সমাজ মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে, বেকার যুবক-যুবতী,কৃষক,-শ্রমিক, সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের আজ নাভিশ্বাস উঠে গেছে। স্বতস্ফূর্ত যোগদান ক্রমশ বাড়ছে বিরোধী শিবিরে। তাই এ মুহূর্তে স্বর্ণালি যুগে উত্তম কুমার অভিনীত বিখ্যাত ছায়াছবি 'সব্যসাচী'র শেষাংশের সংলাপ সবচাইতে যুগোপযোগী— 'সব শেষ হয়ে গেল,আই হ্যাভ লস্ট মাই ভিশন,আবার সবকিছু নতুন করে শুরু করতে হবে'। বর্তমান শাসক সুপ্রিমোর ক্ষেত্রে বুঝি সবথেকে বেশি প্রযোজ্য বলে মনে হচ্ছে। কারণ দীর্ঘ পনেরো বছরের রাজত্বকালে শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য, শিল্প, আইনশৃঙ্খলা প্রভৃতি সর্ব ক্ষেত্রে প্রতি মুহূর্তে যে বিভীষিকাময় দিনগুলো তিল তিল করে রাজ্যবাসী কাটিয়েছেন তা এক কথায় ভয়ঙ্কর— ভবিষ্যতে ইতিহাসের পাতায় তা থাকবে এক অন্ধকারময় অধ্যায় হিসেবে । এত হিংস্রতার ঘটনা এরাজ্যে আগে কখনো দেখা যায়নি। গ্রাম-গঞ্জ-শহরের রাস্তাঘাটে কান পাতলে শোনা যায় যে শোষিত নিপীড়িত, অত্যাচারীত মানুষ মুক্তি চাইছেন। আর শেষ চেষ্টা চালিয়ে তাঁদের কাছে পাওয়ার জন্য শ্রমকে পঙ্গু করে রাজকোষ থেকে দান খয়রাতির ব্যবস্থা করে রাজ্যের অর্থনীতির ভিতটা আলগা করে দেওয়া হচ্ছে। কেবলমাত্র নির্দিষ্ট কতগুলো ভাতা দিয়ে মানুষের কল্যাণ সম্ভব নয়, ডেভেলপমেন্ট আর ওয়েলফেয়ার এক জিনিস নয়, জনগণের আর্থিক সুরক্ষার জন্য চাই সঠিক কর্মসংস্থান, নিশ্চিন্ত জীবনধারণের জন্য চাই নিরপেক্ষ আইন শৃঙ্খলা। দলকে সর্বদা সরকার থেকে পৃথক করে রাখতে হবে, কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে চাই নতুন নতুন শিল্প স্থাপন এবং এজন্য চাই পরিকল্পিত স্থায়ী পরিকল্পনা। দেশের উন্নয়ন নির্ভর করে সরকারি নীতির উপর। ভোটযুদ্ধের বৈতরণী পার হবার লক্ষ্যে শুধু ভাতা প্রদানের মাধ্যমে জনশক্তির মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়ে প্রতিবাদ বিমুখ করে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত জানা গেছে, রাজ্যে প্রায় ৮৪ লক্ষ কর্মহীন বেকার (২১ থেকে ৪০ বছর বয়সি) যুবসাথীর আবেদন করেছেন। কিন্তু ভাতা ঢুকেছে মাত্র ১০ হাজার বেকারের। অথচ বিগত নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি ছিল 'ডবল ডবল চাকরি হবে'। কোথায়? যদিও প্রকৃত কর্মহীন এরাজ্যে কয়েক কোটি। রাজ্যের শ্রমিকরা আজ পরিযায়ী কেন, তার কারণ সরকার কোনো সঠিক সরকারি নীতি নির্ধারণের মাধ্যমে শিল্প স্থাপন করার পরিবেশ রাখেনি,বিগত পনেরো বছরে সাড়ে ছ'হাজার রেজিস্টার্ড কোম্পানি ব্যবসা গুটিয়ে অন্যত্র পাড়ি দিয়েছে। ক্যাবিনেট মন্ত্রীরা দুর্নীতির দায়ে জেল খেটেছেন। রুপোলি পর্দার নায়ক-নায়িকা তথা সেলিব্রিটিদের জনসেবার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, যারা সর্বদা তাদের কেরিয়ার নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। এদিকে দুর্নীতির দায়ে দলের একাধিক ছোটো-বড়ো নেতা-মন্ত্রী নানান দুর্নীতির সঙ্গে নিজেদের জড়িয়ে জেল যাপন করছেন, ফলে এসবের বিবেচনার মাঝেই বলা যায়— শাসক ললাটে যথেষ্ট উদ্বেগের বলিরেখা ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে। দলীয় বিশৃঙ্খলা,পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতি, মিথ্যাচারণ, গুন্ডামি, হুমকি,নানান অপকর্মের ভয়াবহ ফলাফল এতটাই মারাত্মক ও প্রাণঘাতী হতে পারে তারজন্য আগাম সতর্কতার লাগাম পরাতে পারা গেল না। একদিকে অভ্যন্তরীণ দলীয় কোন্দলে জেরবার দলেরই একটা বড়ো সচেতন অংশ, অন্যদিকে দলের অভ্যন্তরে হঠাৎ গজিয়ে ওঠা বেশ কিছু অসামাজিক ভুঁইফোড়দের লাগামহীন অন্যায্য দখলদারিত্ব দলীয় মর্যাদাকে নির্মমভাবে হত্যা করে সমাজের অভ্যন্তরে একটা ভুল বার্তা প্রেরণ করেছে। ফলে এহেন মারাত্মক সংকট মোকাবিলায় প্রতিফলিত হয়েছে শাসক সুপ্রিমোর অকর্মণ্য অভিভাবকত্ব। সেইজন্যই এই পরিমাণ দানখয়রাতি,ভাতা। দুর্নীতি আর দুর্বৃত্তায়নকে হাতিয়ার করে কোনো রাজ্য বেশি দিন শাসন চালাতে পারে না।

সংসদীয় গণতন্ত্র তখনই মজবুত হয়, যখন তাতে সঠিক অভিভাবকত্ব থাকে, তার সঙ্গে শৃঙ্খলা, নীতি, আদর্শের থাকে বিশ্বস্ত অনুশীলন।

জনগণকে সুশাসন দিতে গেলে সরকারের সদিচ্ছা এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এখানে সরকার তথা সরকারের মন্ত্রী যখন প্রকাশ্যে ওয়াকফের বিরোধিতা করে উসকানিমূলক ভাষণ দিচ্ছেন সেখানে সরকারের পুলিশ মার খাচ্ছে,আবার সরকার যখন চাইছে অযোগ্য শিক্ষকদের চাকরি বাঁচাতে, তখন এই পুলিশই যোগ্য শিক্ষকদের পেটে লাথি মারছে। শুধুমাত্র শিক্ষায় অযোগ্য বাছতে গিয়ে হাজার হাজার যোগ্যদেরও বলি দিতে হলো এই সরকারের ইচ্ছায়।

এসআইআর এক রুটিন মাফিক সাংবিধানিক প্রক্রিয়া। এই সাংবিধানিক প্রক্রিয়াকে যেনতেন প্রকারে রুখতে হাজার হাজার কোটি টাকার ঋণের আর্থিক বোঝা বাড়িয়ে রাজ্য সরকার দেশের তাবড় তাবড় উকিলের পিছনে কোটি কোটি টাকা খরচ করে এর বিরোধিতা করে আসছে। শুধু নীরবে নিভৃতে অভয়ার প্রেতাত্মা সভ্য মানবতার কাছে চিৎকার করে বলছে, 'আইন মিথ্যে,আদালত মিথ্যে,সরকার মিথ্যে, বিচার মিথ্যে। দাও ফিরিয়ে আমার সেই নিষ্পাপ জীবন, যেখানে আমার স্বপ্নের ভবিষ্যৎ লুকিয়ে ছিল'। বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সরকারি প্রকল্প বাস্তবায়নের শুধু অনীহা নয়, এগুলির চরম বিরোধিতা করায় অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে রাজ্যকে কেন্দ্রের সঙ্গে বিরোধে অবতীর্ণ হতে হচ্ছে এবং এই অপরিণামদর্শিতার কারণে রাজ্যের উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে।

দলকে শক্তিশালী ও সজীব রাখতে গেলে ঐতিহাসিক সংকট থেকে শিক্ষা নিয়ে সংশোধনের প্রচেষ্টা নিতে হয়। কারণ একটি কথা ভুলে গেলে চলবে না যে রাজনীতিতে প্রতিটি মুহূর্ত যেমন অনিশ্চিত, তেমনই এর সুনির্দিষ্ট অভিমুখ বোঝাও যথেষ্ট কঠিন। বিরোধী দলের নেতা হিসাবে যা মানায় সেটা মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে মানায় না। সম্প্রতি ধর্মতলা অবস্থান মঞ্চ থেকে তাঁর কণ্ঠে শোনা গেল, 'আমরা আছি বলেই আপনারা সবাই ভালো আছেন। যদি আমরা না থাকি, কোনও দিন সেই রকম আসে, এক সেকেন্ড লাগবে না। একটা কমিউনিটি জোট বেঁধে ঘিরে ফেললে এক সেকেন্ড লাগবে, একদম বারোটা বাজিয়ে দিতে। যদি নিজেদের ১৩টা বাজাতে না চান, তাহলে বিজেপির অপপ্রচারে কোনও দিন ভুল বুঝবেন না।' রাজ্যের একজন প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে এই অসাংবিধানিক কথা বলা শোভা পায়? এখনো যারা শাসকদলে তথাকথিত সেকুলার হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিচ্ছেন তাঁদের একবার ভালো করে ভেবে দেখতে হবে যে, মুখ্যমন্ত্রী কী বার্তা তিনি দিতে চাইছেন? অর্থাৎ তিনি নিজেই স্বীকার করে নিচ্ছেন যে এতদিন বিরোধীরা 'সাম্প্রদায়িক তুষ্টীকরণ'-এর যে তত্ত্ব চীৎকার করে বলে আসছিল সেটাই মান্যতা পেল। সবচেয়ে বড়ো কথা হলো, যে সম্প্রদায়ের কথা তিনি বলে গেলেন তাদের সম্পর্কে তাঁর দূরদৃষ্টি কী মারাত্মক নিম্নমানের, কত সাংঘাতিক তা বলাই বাহুল্য। আর যাদের উদ্দেশে বললেন এটা তাদের জন্যও কি সরাসরি হুমকি নয়? তাহলে কি ধরে নেওয়াই যায় শত শত বছর ধরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের তপোবনে তিনি হিংসার আগুন জ্বালাতে চাইছেন শুধুমাত্র সংকীর্ণ রাজনীতির স্বার্থে? কেন ক্যানিং, নদীয়া, কালিয়াচক, ধুলাগড়, বাদুড়িয়া-বসিরহাট, বেলডাঙা হলো?

সংসদীয় গণতন্ত্র তখনই মজবুত হয়, যখন তাতে সঠিক অভিভাবকত্ব থাকে, তার সঙ্গে শৃঙ্খলা, নীতি, আদর্শের থাকে বিশ্বস্ত অনুশীলন। দীর্ঘ চৌত্রিশ বছরের বাম অপশাসনের বোঝা সরিয়ে সরকার গঠনের আগে বর্তমান শাসক দলের মূল স্লোগানই ছিল, 'বদলা নয়, বদল চাই'। আসলে প্রকৃত অর্থে এর নেপথ্যে ছিল সিপিএমকে বাঁচিয়ে রাখার খেলা। এরাজ্যে সত্যিকারের কোনো রাজনৈতিক বিরোধী দল উঠে এলে তাদের জন্য তৃণমূলনেত্রীর পরিকল্পনায় ছিল বদলা নেওয়ার চূড়ান্ত রূপরেখা। তার প্রমাণ ২০২১-এ দেখেছে রাজ্যবাসী। ক্ষমতা লাভের সঙ্গে সঙ্গেই বিরোধীদের পার্টি অফিস দখল এবং রাজ্যের প্রধান বিরোধী দলের কর্মী হত্যার মধ্যে দিয়ে যে পরিকল্পনার অভিষেক ঘটেছিল। এ রাজ্যের প্রধান বিরোধী দলের নেতা-কর্মী-সমর্থকদের হত্যা করা, অজস্র নেতা-কর্মীকে অন্যায়ভাবে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়ার মধ্যে দিয়ে বিরোধীমুক্ত পশ্চিমবঙ্গ তৈরি করে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা হয়। দলীয় মাসল্‌ম্যানদের অতিসক্রিয়তায় ২০২১-এর পর হাজার হাজার মানুষকে ঘরছাড়া থাকতে হয় বছরের পর বছর। যে বাম সরকারকে উচ্ছেদ করে সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের উত্থান, ক্ষমতায় আসার ১৫ বছর পরে প্রশাসন পকেটে রেখেও বামপন্থী হার্মাদদের জেলে ঢোকাতে পারেননি। বরং সেই হার্মাদদের একাংশ ২০১১-র পর তৃণমূলি সন্ত্রাসীতে পরিণত হয়েছে। বারবার মুখ্যমন্ত্রী-রাজ্যপাল সংঘাত, মুখ্যমন্ত্রী-নির্বাচন কমিশনার সংঘাত, রাজ্য সরকার-কর্মচারী সংঘাত প্রভৃতি সংঘাত দেখতে দেখতে সাধারণ মানুষ অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। দলীয় নেতা-কর্মীদের দলত্যাগ যদি বিশ্বাসঘাতকতা হয় তাহলে মানস ভুঁইয়া, রেজ্জাক মোল্লা, নির্বেদ রায়, মালা রায়, ওমপ্রকাশ মিশ্র, ঋতব্রত, বাবুল সুপ্রিয়,জয়প্রকাশ মজুমদার এবং সম্প্রতি প্রতিকুর রহমান প্রমুখ বিরোধী দলের এরকম অজস্র তথাকথিত বিশ্বাসঘাতকদের শাসক দলে বরণ করা হলো কোন রসায়ন মেনে? সারদা মামলার জেলখাটা আসামি কুণাল ঘোষ যে মুখ্যমন্ত্রীরই বিরুদ্ধে তুলেছিল টাকা আত্মসাতের তীব্র অভিযোগ, কোন যাদুবলে তাকেই আবার দলের নীতির মুখপাত্র বানান্যা হলো, কেনই-বা তাকে প্রার্থী করা হলো? কেনই-বা প্রার্থী করা হলো জেলখাটা জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, পরেশ অধিকারীকে? মানুষ কিন্তু ভালো চোখে নেয়নি এগুলো। আজ রাজ্যের প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক শক্তির নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে জেহাদি শোষণমুক্ত, সন্ত্রাস মুক্ত রাজ্য গড়ার প্রচেষ্টা চলছে। সেই কাজে সাহায্য করতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে বহু দলত্যাগী নেতা, কর্মীরাও বর্তমানে তৎপর হয়েছেন। এমতাবস্থায় এই ঐক্যবদ্ধ নবজাগরণকে মোকাবিলা করার মতো নেতা-কর্মী তৃণমূলে থাকলেও এ লড়াই জিততে বিগত নির্বাচনের মতো দু'হাতে আশীর্বাদ তোলা মানুষগুলোকে তৃণমূলনেত্রী পাশে পাবেন তো? হয়তো সময় বলবে, এ নির্বাচনে তৃণমূলের প্রত্যাবর্তন না চিরতরে বিসর্জন? □

বাংলাদেশে তারেক জিয়ার প্রধানমন্ত্রিত্বে সংখ্যালঘুদের কি ভাগ্যের পরিবর্তন হবে!

রঞ্জন কুমার দে

নির্বাচন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সংখ্যালঘুদের উপর অনেক সহিংসতার খবর এখনো রীতিমতো উঠে আসছে। তবুও দেশটির সংখ্যালঘু সমাজ প্রধানমন্ত্রী তারেক জিয়ার প্রধানমন্ত্রিত্বে আশা করে আছেন, হয়তো-বা এখন ভাগ্যের পরিবর্তন হবে!

বাংলাদেশের ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনে দুই তৃতীয়াংশ আসন নিয়ে ক্ষমতা নিশ্চিত করছে বাংলাদেশ ন্যাশনাল পার্টি (বিএনপি)। মাত্র দেড় মাস আগে দলটির চেয়ারপার্সন তারেক জিয়া মায়ের মৃত্যুশয্যায় ১৭ বছর পর দেশের মাটিতে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। যদিও তারেক বিদেশ থেকেও দলটিকে ভার্চুয়ালি পরিচালনা করে আসছিলেন। তাঁর প্রথম ভাষণেই জনগণের উদ্দেশে ছিল 'I have a plan', যার মাধ্যমে তিনি দেশের প্রত্যেক গরিব পরিবারের জন্য একটা করে ফ্যামিলি কার্ড করে দেওয়ার নির্বাচনী অঙ্গীকার করেন। তারেক রহমানের সংক্ষিপ্ত নির্বাচনী প্রচারে একটি বারের জন্যও বিরোধী দলগুলোর প্রতি কাঁদা ছোড়াছুড়িতে পাওয়া যায়নি, বরং আগাগোড়া তিনি ছিলেন মার্জিত, সকলের প্রতি নমনীয়। সংসদ নির্বাচনে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া তেমন কোনো হিংসার ঘটনা ঘটেনি, প্রায় সব কয়টা পরাজিত দল নিজেদের হার স্বীকার করে নিয়েছেন। শেখ হাসিনা ও আওয়ামি লিগ নেতৃত্ব বিভিন্নভাবে 'No Boat, No Vote'-এর আবেদন জানিয়ে আসছিল, কিন্তু দেশের প্রায় ৬০ শতাংশের ভোট প্রদান দেশের নতুন সরকার গঠন করছে। নির্বাচনে সম্মুখ সমরে ছিল বিএনপি এবং জামাত- ই-ইসলামি নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোট। অতীতের প্রত্যেকটি নির্বাচনে এই জামাত এবং বিএনপি জোট হাসিনার আওয়ামি লিগের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আসছিল, কিন্তু এবার লিগ নিষিদ্ধ থাকায় ক্ষমতার ভাগাভাগিতে এই দুই দলই প্রধান ছিল।

২০২৪ সালে জেহাদি ছাত্র জনতার অভ্যুত্থানে উঠে আসা ছাত্রদের নব-রাজনৈতিক দল ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টিও (এলসিপি) বেশ চর্চায় ছিল। তাদের গ্রহণযোগ্যতার এসিড টেস্টের, জামাতের জোট সঙ্গী হয়ে তারা ৬টি আসন নিজেদের দখলে আনতে বেশ সক্ষম হয়। আওয়ামি লিগের অনুপস্থিতিতে বিএনপি এবার দেশের স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ চেতনার পক্ষে তুলে আসছিল। দীর্ঘ ১৭ বছর হাসিনার স্বৈরশাসনে প্রায় একঘরে হয়ে থেকেছিল বিএনপি। ইউনুস সরকার অঘোষিত জামাত-ই-ইসলামের নেতৃত্বাধীন সরকার এমনটাই মানা হয়ে থাকে, তাই জামাতের হয়ে নির্বাচনী কারচুপির একটা আশঙ্কা থেকেই ছিল বিএনপির। সকল বাধা পেরিয়ে তারেক জিয়া নেতৃত্বাধীন বিএনপি জোট এখন ক্ষমতায় আসীন। চিরকালই হিন্দু জনগোষ্ঠীকে আওয়ামি লিগের ভোট ব্যাংক মনে করা হতো, কিন্তু এইবার আওয়ামি বিহীন নির্বাচনে বিএনপি ছিল তাঁদের প্রথম পছন্দ। যদিও জামাতও প্রচুর চেষ্টা করেছে হিন্দু সমাজের কাছে পৌঁছতে, এই প্রথম তারা কৃষ্ণ নন্দী নামের সংখ্যালঘু একজনকে টিকেটও দিয়েছিল, নির্বাচনে যদিও তিনি পরাজিত হন। এবার জামাতের অন্যতম একটা স্লোগান ছিল 'হরে কৃষ্ণ হরি বোল, দাঁড়িয়া পাল্লা টেনে তোল'। এরকম আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল জামাত ক্ষমতায় এলে হিন্দুরা নাকি জামাই আদরে থাকবেন। বিএনপি এবার ধর্মীয় এবং জাতিগত সংখ্যালঘু থেকে ছয় জনকে টিকেট দিলেও চার জন জিতে আসতে পারেন, এনসিপি একজন সংখ্যালঘুকে টিকিট দিয়েছিল। ত্রয়োদশ এই জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংখ্যালঘু সমাজ থেকে ছয় জনকে টিকিট দিলেও চারজন জিতে আসতে পারেন, এনসিপি একজন সংখ্যালঘুকে টিকিট দিয়েছিল। ত্রয়োদশ এই জাতীয় সংসদ

নির্বাচনে সংখ্যালঘু ধর্মীয় সমাজে বেশ উপস্থিতি ছিল, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সর্বমোট ৬৭ জন ধর্মীয় সংখ্যালঘুকে মনোয়ন দিয়েছিল, এছাড়া স্বতন্ত্র হিসেবেও ১২ জন প্রার্থী ছিল।

দেশটির বামসংগঠনগুলি হয়েছে কোণঠাসা, রিক্তহস্তে ফিরতে হয়েছে নির্বাচনী ময়দান থেকে। বামপন্থী দলগুলো যেমন বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বিএসডি), কমিউনিস্ট পার্টি অব বাংলাদেশ, বাংলাদেশ সোশালিস্ট পার্টি (যাসরনি), জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) ইত্যাদি কোনোটিই একটি আসনও জিততে পারেনি। দেশটিতে স্বাধীনতার পর বামদের একটা শক্ত দুর্গ থাকলেও ক্রমান্বয়ে নীতি আদর্শের তারতম্যে তারা ক্রমশ বিলুপ্তপ্রায়। তাছাড়া দলীয় কোন্দলে দেশে মোল্লবাদী সংগঠনগুলোর মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা, হাসিনার সঙ্গে জোট বিচ্ছেদ প্রভৃতি অনেক কারণও আছে। হাসিনার একটা ফিক্সড ভোটব্যাংক বাংলাদেশে এখনো রয়েছে সেটা যেকোনো কেউ মানতে বাধ্য, বিশেষত মুক্তিযুদ্ধকামী এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মধ্যে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা বারবার পরীক্ষিত, তাই তাঁর সমর্থকদের উদ্দেশ্য বার্তা ছিল ভোট বয়কটের। প্রায় ৬০ শতাংশের ভোটদান কার্যত হাসিনাকে অগ্রাহ্য করলো শুধু নয়, বিগত দুই সাংসদ নির্বাচন তথা ২০১৪ (৪০.০৪ শতাংশ) এবং ২০২৪ (৪২.০৪ শতাংশ) এর থেকে তুলনামূলকভাবে এবার অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য।

কার্যত শেখ হাসিনা বিরোধী শক্তিগুলির প্রতি হামলা-মামলার দমন নীতিতে চরম ফ্যাসিবাদী হয়ে উঠেছিলেন শেষদিকে। জামাত-ই- ইসলামি ক্ষমতায় পৌঁছতে না পারলেও তাঁদের আসন সংখ্যা এক লাফে ৬৭টিতে স্পর্শ করেছে, বিগত নির্বাচনগুলোতে অংশগ্রহণ তাদের আসন ছিল যথাক্রমে মাত্র ১৭,৩,১৫ ও ২। জামাত-ই-ইসলামিকে দেশের স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি মানা হয়, তাই তাদের প্রাপ্ত এই আসনসংখ্যা নিঃসন্দেহে উদ্বেগের কারণ এরজন্যে বিএনপি হাসিনাকে দোষারোপ করছে, কারণ লিগ প্রধান বিরোধী শক্তি বিএনপিকে হুমকিস্বরূপ ভাবতো এবং প্রতিহিংসায় তাঁদের রাজনৈতিক কোমর ভেঙে রেখে দিয়েছিল। ফলস্বরূপ জামাত বিকল্প হয়ে রাজনীতিতে উঠে আসতে পেরেছে। নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করেও প্রধানমন্ত্রী তারেক জিয়া যথেষ্ট সংযত আচরণ করছেন, এমনকী তিনি দলকে বিজয় মিছিল না করতেও আদেশ দিয়েছিলেন। নির্বাচন পরবর্তী প্রত্যেকটি আলোচনায় তিনি প্রতিহিংসামূলক রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে সবার প্রতি ঐক্যের বার্তা দিচ্ছেন।

ভারত সরকারও তারেক জিয়ার সঙ্গে কাজ করতে খুব আগ্রহী, সেটা খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোকবার্তায় খোদ বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্করের উপস্থিতি কিংবা ভারতের সংসদে প্রাক্তন বিএনপি প্রধানের মৃত্যুতে নীরবতা পালন নিঃসন্দেহে ইতিবাচক ছিল। প্রধানমন্ত্রী মোদী তারেক জিয়াকে নির্বাচনে বিজয় অভিনন্দনে আগামীদিনে দু-দেশের সম্পর্ক আরও মজবুতের আশা ব্যক্ত করেছেন এবং ভারতকেও এখন যথেষ্ট সৌজন্যতা দেখাচ্ছে ঢাকা। হাসিনার সঙ্গে ভারতের সুসম্পর্ক থাকায় বিগত দিনে ভারত-বাংলাদেশ রাজনীতিতে প্রায় ছোঁয়াচে ছিল বিএনপি-জামাত, সেই সুবাদে তাঁদের নেতা-কর্মীরা চরম ভারত বিদ্বেষী হয়ে উঠেছিলেন। এদের মধ্যে লুৎফুজ্জামান বাবর (বিএনপি), আব্দুস সালাম পিন্টু (বিএনপি) এবং এটিএম আজহারুল ইসলাম (জামাত) হাসিনা আমলে দেশবিরোধী কর্মকাণ্ডে ফাঁসির সাজাপ্রাপ্ত, এরা এইবার ভোটে নির্বাচিত হয়ে এসেছেন। তাই ভারতের সঙ্গে তারেক জিয়ার নেতৃত্বে দু'দেশীয় সম্পর্ক কতটা মসৃণ হবে, সন্দিহান।

বিএনপি-র রাজনৈতিক প্রত্যাবর্তনে দেশের সংখ্যালঘু সমাজ, মুক্তিযুদ্ধ চেতনাধারী, এমনকী খোদ আওয়ামি লিগের অনুগামীরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। নির্বাচনের প্রাক্‌মুহূর্তেও বিএনপি-র শীর্ষস্থানীয় নেতারা ঘোষণা করেছিলেন বিএনপি ক্ষমতায় এলে আওয়ামি লিগের তৃণমূল পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের আর হয়রানি করা হবে না, এমনকী তাদের উপর থেকে মিথ্যা মামলা তুলে নেওয়া হবে। নির্বাচনী ফল ঘোষণার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই দেখা যায় পঞ্চগড় বিএনপির জেলা নেতৃত্বের আওয়ামি লিগের তালাবন্ধ কার্যালয় মুক্ত করে দেওয়া হয়, নিঃসন্দেহে সেটা প্রশংসনীয়। হ্যাঁ, ভোট এবং জুলাই সনদ বিএনপির আরেক গলার কাঁটা, কারণ ভোটকে ইউনুস যেকোনোভাবে পাশ করিয়ে নিয়েছে। তথাকথিত ছাত্র-জনতা গণঅভ্যুত্থানে পেছনের দরজা দিয়ে এনসিপিকে জামাত বি টিম বানিয়ে মহম্মদ ইউনুসের মাধ্যমে তারা ক্ষমতায় এসেছিল। স্বাধীনতা বিরোধী এই শক্তিকে ২০২৪-এর আগস্টের পর দেশের মানুষ দেখেছে কীভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের গলায় জুতার মালা পরিয়ে হেনস্থা করার, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি, ভাস্কর্য সব গুঁড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা। তারা দেশটির জাতীয় সঙ্গীত এবং সংবিধানে কাচি চালানোর চরম চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে অবশেষে এই জুলাই সনদের মাধ্যমে আবার ক্ষমতায় টিকে থাকতে চায়।

২০২৪-এর জুলাই-আগস্টে যতরকম নৈরাজ্য, হত্যা, হিংসা তারা করেছে এটার বৈধতা হলো এই সনদপত্র। ৭১-এর গণহত্যাকারীদের একসময় ফাঁসি কাঠে ঝুলতে হয়েছিল। ভবিষ্যতে হাসিনার প্রত্যাবর্তন হলে যাতে এই রাজাকার নাতিপুতিদের ভাগ্যে সেটা পুনরাবৃত্তি না হয় তাই এই জুলাই সনদের আয়োজন। এটাতে অনেক মতোবিরোধ ও বিতর্ক প্রথম থেকেই রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ছিল। যেগুলোর মধ্য অন্যতম দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং দলের প্রধান একই ব্যক্তি থাকতে পারবেন না, প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা খর্ব করতে দুই কক্ষ বিশিষ্ট সংসদে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব প্রভৃতি। তবে দেশটির সংবিধানে এইরকম সনদ বা গণভোটের কোনো ভিত্তি বা বৈধতা নেই, সংসদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। অতীতে বিএনপির শাসনকালে ধর্মীয় সংখালঘুদের তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে, এরপরও তারা উদার চিত্তে দু'হাত উজাড় করে এইবার বিএনপির ধানের শীষে ভোট দিয়েছে। ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা চায় শুধু বাঁচার নিরাপত্তা, তাই বিগত দিনগুলোতে সবকয়টি সংখ্যালঘু হত্যা, জমি দখলের বিচার, প্রভুচিন্ময় দাস-সহ সব নিরপরাধ মানুষকে নিঃশর্ত মুক্তি চায় সর্বস্তরের হিন্দুরা। সোশ্যাল মিডিয়ায় নির্বাচন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সংখ্যালঘুদের উপর অনেক সহিংসতার খবর এখনো রীতিমতো উঠে আসছে। তবুও দেশটির সংখ্যালঘু সমাজ প্রধানমন্ত্রী তারেক জিয়ার প্রধানমন্ত্রিত্বে আশা করে আছেন, হয়তো-বা এখন ভাগ্যের পরিবর্তন হবে! □

আমরা কি এই পরিবর্তন চেয়েছিলাম?

অজিত ভকত

প্রায় সাড়ে তিন দশক ধরে চেপে বসা একটা জগদ্দল পাথরের চাপে রাজ্যের মানুষের জীবন যখন হাঁসফাঁস করছিল, তাদের শাসনে অত্যাচার, অনাচার থেকে মুক্তির পথ খুঁজেছিলেন, তখন রাজ্যের মানুষ দল-মত নির্বিশেষে একত্রিত হয়ে পরিবর্তনের ডাক দিয়েছিলেন। ২০১১ সালে বহু কাঙ্ক্ষিত সেই পরিবর্তন ঘটে। মানুষ স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল যে একটা স্বচ্ছ, দুর্নীতিমুক্ত, জনদরদি সরকার রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেছে, এবার বুঝি রাজ্যবাসীর রাহুমুক্তি ঘটবে। কিন্তু বাস্তবে ঘটল তার উলটো।

পূর্ববর্তী সরকারের সেই কলঙ্কময় ট্র্যাডিশন আজকের সরকারও সমানভাবে বহন করে চলেছে। পরিবর্তনের এত বছর পরেও রাজ্যের মানুষ আতঙ্কের মধ্যেই দিন কাটাচ্ছেন। আজও বহু মানুষ খুন হচ্ছে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। আগের সরকারের আমলেও বহু মানুষ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারতেন না, পরিবর্তনের পরেও পারেননি। অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। বিহার, উত্তরপ্রদেশ একসময় নির্বাচনী খুন-খারাপির জন্য শীর্ষস্থান লাভ করেছিল। এখন পশ্চিমবঙ্গ সেই স্থান দখল করেছে। তাহলে সরকার পরিবর্তন করে রাজ্যের মানুষের কী লাভ হলো?

আগেও নির্বিবাদে জমিদখল করেছে সরকারের গুন্ডাবাহিনী, এখনও জোর করে জমি ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনা ঘটছে পাড়ায় পাড়ায়। আগেও নারী নির্যাতনের ঘটনা যেমন জল-ভাত ছিল, আজও রাজ্যজুড়ে অবলীলায় নারীর সম্মানহানি ঘটছে, মহিলারা ধর্ষিতা হচ্ছে রাজনৈতিক সন্ত্রাসীদের হাতে। আগের সরকারের আমলে যেমন যোগ্য প্রার্থীদের চাকরি না দিয়ে নিজের পছন্দের মানুষকে চাকরি পাইয়ে দেওয়া হয়েছে, আজকের সরকারও টাকার বিনিময়ে হাজার হাজার চাকরি বিক্রি করেছে। আর যোগ্য চাকরিপ্রার্থীরা দিনের পর দিন রাস্তায় বসে অনশন করছেন। আগে দুর্নীতিবাজ, খুনি, ভোট-লুঠেরারা সরকারের প্রশ্রয়ে লালিত-পালিত হয়েছে। আর আজ খুনি, তোলাবাজ, দুর্নীতিগ্রস্তদের বাঁচাতে এই সরকার প্রকাশ্যে এগিয়ে এসেছে, পাশে দাঁড়িয়েছে। সরকারের মন্ত্রী, আমলা, শাসক দলের বিভিন্ন নেতানেত্রী সরাসরি দুর্নীতিতে লিপ্ত হয়েছেন, জেল খেটেছেন। পুলিশ প্রশাসনেরও একাংশ আজ দুর্নীতির হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। এসব ঘটনা নিশ্চয়ই রাজ্যকে গৌরবান্বিত করেনি! তাই ভাবতে হচ্ছেই, আমরা কি এই পরিবর্তনই চেয়েছিলাম? ভেবে দেখুন, আরও একবার পরিবর্তনের সময় এসে পড়েছে কিনা!

ভারতের কোনো রাজ্যে বিরোধীদের এভাবে প্রকাশ্যে হুমকি দেওয়ার ঘটনা বিরল। পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদের প্রকাশ্যে শাসানো হচ্ছে, 'আমরা ক্ষমতায় না থাকলে একটি বিশেষ কমিউনিটি রাস্তায় নেমে সব লণ্ডভণ্ড করে দেবে'। 'নির্বাচনের পর বিজেপি সমর্থকরা পিঠে পোস্টার লাগিয়ে ঘুরে বেড়াবে যে আমরা বিজেপি করি না'। কোনো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং জনসমক্ষে এই ধরনের বক্তব্য রাখতে পারেন এটা ভাবলেও অবাক হতে হয়। যারা দেশের সংবিধান, দেশের আইন আদালত, বিচারপতিদের ক্রমাগত অসম্মান করছে, জনগণের দেওয়া করের কোটি কোটি টাকা খরচ করে দুর্নীতিগ্রস্ত, দেশবিরোধীদের বাঁচাতে বারবার সর্বোচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হচ্ছে, তাদের কাছে এর বেশি প্রত্যাশা করা যায় না। যারা দেশের সীমান্ত রক্ষী ও সেনা জওয়ানদের অসম্মান করে নিজেদের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে চায় তাদের আচরণে রাজ্যবাসী হিসেবে আমাদের লজ্জা পাওয়া উচিত। যারা নিজের দেশের মানুষের ভোটাধিকার, সম্পদের অধিকার, চাকরির অধিকারের চাইতে বিদেশি অনুপ্রবেশকারীদের অধিকার নিয়ে বেশি সোচ্চার হয় ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থের তাগিদে, তাদের শাসন ক্ষমতায় থাকার অধিকার দেওয়া উচিত কিনা ভেবে দেখার সময় এসেছে। সংবিধানের শপথ নিয়ে যারা দেশের সাংবিধানিক প্রধানকে বারবার কটু ভাষায় অসম্মান করছে, সাংবিধানিক প্রক্রিয়াকে ভেস্তে দেওয়ার জন্য ক্রমাগত মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছে, তারা সাংবিধানিক পরিকাঠামো বজায় রাখার ক্ষেত্রে বিপজ্জনক। দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে এমন বিপজ্জনক সরকারকে বিসর্জন দেওয়ার দায়িত্ব কি নেবেন না রাজ্যের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ? যারা কথায় কথায় 'পশ্চিমবঙ্গ ও বাঙ্গালি'র রক্ষাকর্তা হিসেবে নিজেদের জাহির করার চেষ্টা করছে, বাস্তবে তারাই বাঙ্গালির পিঠে ছোরা মারছে। দেশে এবং দেশের বাইরেও বাঙ্গালিকে আজ হেয় হতে হচ্ছে এদের জন্যই। তোষণ রাজনীতির কালো গহ্বরে ঠেলে দিচ্ছে এরাজ্যকে। বাঙ্গালি অস্মিতাকে ঢাল বানিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে কার্যত জেহাদিদের আশ্রয়স্থল বানানোর চক্রান্তকারীদের মুখোশ খুলে দিতে আসন্ন নির্বাচন একটা বড়ো হাতিয়ার। রাজ্যবাসীর সুচিন্তিত ভোটাধিকার প্রয়োগই আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে। □

নিঃশব্দে সরে যাওয়া মেয়েটি

সোনাঝুরি গ্রামের সরু কাঁচা রাস্তায় বিকেল হলেই খেলে বেড়াত দুটি মেয়ে। মেঘলা আর তৃষা। ওদের দেখে সবাই বলত, একটা ছায়া আর একটা সঙ্গী। কখনো

কদমগাছের নীচে বসে গল্প, কখনো পুকুরের পাড়ে বসে পা দোলানো। ওদের দিনগুলো যেন টুকরো টুকরো আনন্দে ভরা ছিল।

মেঘনা খুব শান্ত। অন্তর্মুখী। তৃষা ঠিক তার উলটো। হাসি খুশি, প্রাণবন্ত। তবু ওদের মধ্যে এমন বন্ধুত্ব ছিল যে তাদের আলাদা করা কঠিন।

একদিন স্কুলে মেঘনা তার বাবার দেওয়া নতুন দামি কলমটি নিয়ে এসেছিল। কলমটি ওর খুব প্রিয়। টিফিনের সময় তৃষা মেঘনার হাত থেকে নিয়ে সেটি দেখতে লাগল। হঠাৎ কলমটি তার হাত থেকে মাটিতে পড়ে ভেঙে গেল।

মুহূর্তটি যেন থমকে থেমে গেল .....।

মেঘনার চোখে বেদনার ছায়া ফুটে উঠল। কোনো কথা না বলে সে কলমটি তুলে নিল। তৃষা বার বার বলতে চাইল সে তো ইচ্ছা করে করেনি। কিন্তু কথাগুলো যেন গলায় আটকে রইল।

সেই দিনটার পর থেকে সবকিছু বদলে গেল। তৃষাদের পরিবার অন্য কোথাও চলে গেল।

সময়ের স্রোত বয়ে যেতে যেতে আবার মেঘনা ও তৃষা দুজনেই এক স্কুলেই ভর্তি হলো— ক্লাস ইলেভেন। ইউনিফর্মে শাড়ি, নতুন বই, নতুন ক্লাসরুম। কিন্তু পুরনো অভিমানটি কি এখনো একই জায়গায় আটকে রয়েছে!

প্রথম দিনই ওরা পরস্পরকে চিনে ফেলেছে। তবু কেউ এগিয়ে এসে কথা বলেনি। ক্লাসে একই সারিতে বসেও যেন তাদের মাঝে একটা দেওয়াল দাঁড়িয়ে রয়েছে।

এই সময়েই ওদের জীবনে এল মধুমিতা।

মধুমিতা খুব সহজ, সরল। সবার সঙ্গে মিশতে পারে। এই কদিনের মধ্যেই সে সবারই বন্ধু হয়ে গিয়েছে। তাই সে বুঝতে পারল যে এই দুটি মেয়ের মধ্যে কিছু একটা ঘটেছে। যা একেবারে ঠিক নয়। অথচ ওদের দুজনের চোখে এমন আকুলতা ও আন্তরিকতার ভাব ফুটে ওঠে যা অচেনা কারোর পক্ষে সম্ভব নয়।

একদিন টিফিনের সময় মধুমিতা বলে উঠল, তোমরা দুজনে কি বন্ধু, আগে থেকে পরিচিত?

মেঘনা আর তৃষা দুজনেই একসঙ্গে বলে উঠল, না। তারপর দুজনেই চুপ। মধুমিতা একটু অবাক হলেও হাল ছাড়ল না। সে ইচ্ছে করেই একটি গ্রুপ প্রজেক্টে মেঘনা ও তৃষার নামও লিখিয়ে দিল। শুরুতে অস্বস্তি থাকলেও কাজের প্রয়োজনে মেঘনার সঙ্গে তৃষাকে কথা বলতে হলো— 'এই অংশটি তুই লিখবি'— তৃষা খুব ধীরে বলল।

মেঘনা শুধু একটু মাথা নাড়ালো। এভাবে ছোটো ছোটো কথার মধ্যে দিয়েই যেন বরফ একটু একটু করে গলতে শুরু করল।

একদিন স্কুল ছুটির পর বৃষ্টি নামল। সবাই ছাতা মাথায় বাড়ি ফিরছে। কিন্তু মেঘনার কাছে ছাতা ছিল না। তৃষা একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিল। একটু ইতস্তত করে এগিয়ে এসে বলল —চল, একসঙ্গে যাই। মেঘনা কোনো কথা না বলে তার পাশে এসে দাঁড়ালো। মধুমিতা ছুটে এসে তৃষাকে ধন্যবাদ জানালো।

একই ছাতার তলায় হাঁটতে হাঁটতে দুজনেরই মনে হলো এটা শুধু বৃষ্টির মধ্যে একসঙ্গে বাড়ি ফেরা নয়, বহুদিনের নীরবতার পর আবার নিজেদের ফিরে পাওয়া।

পরদিন স্কুলে মধুমিতা বলল, 'তোমাদের দুজনকে একসঙ্গে দেখলে মনে হয় তোমরা অনেক পুরনো বন্ধু। তৃষা হেসে ফেলল। মেঘনাও তাকিয়ে রইল। মধুমিতা আবার বলল, কিছু সম্পর্ক এমন হয় যা কোনো কারণে আলাদা হয়ে গেলেও আবার একদিন ঠিক হয়ে যায়।

সেদিন ছুটির পর মেঘনা তৃষাকে বলল, তুই কি এখনো আমার উপর রাগ করে আছিস? তৃষা মাথা নেড়ে বলল— না, অনেকদিন আগেই রাগটি হারিয়ে গেছে। শুধু কথাটি বলার সাহস পাইনি।

মেঘনা হেসে বলল, আমিও।

দূরে দাঁড়িয়ে মধুমিতা সব শুনছিল। কাছে এসে ওদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ওদের দুই হাত দুজনের হাতে ধরিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে সরে গেল সেখান থেকে।

—**মৌমিতা দেবনাথ,** দ্বাদশ শ্রেণী,
নিমতা, কলকাতা-৪৯।

জাতীয় উদ্যান

রণথম্ভোর জাতীয় উদ্যান

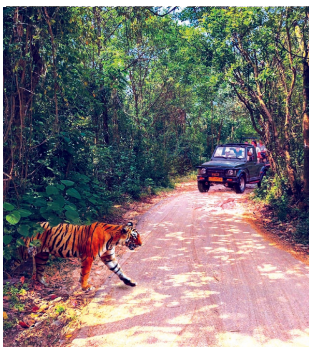

রণথম্ভোর জাতীয় উদ্যান রাজস্থানের সওয়াই মাধোপুর জেলার রণথম্ভোর দুর্গের নামানুসারে করা হয়েছে যা উদ্যানের মধ্যেই অবস্থিত। রাজ্যের রাজধানী জয়পুর থেকে ১৩০ কিলোমিটার দূরে। এই উদ্যান উত্তরে বনাস নদী এবং দক্ষিণে চম্বল নদী দ্বারা বেষ্টিত। এর আয়তন ১,৩৩৪ বর্গকিলোমিটার। এই উদ্যানে ৩০০ প্রজাতির বেশি গাছপালা রয়েছে, তার মধ্যে ১০০ রকমের ঔষধিগুণসম্পন্ন। রয়েছে চিতল, সম্বর, কৃষ্ণসার হরিণ, চিঙ্কারা, নীলগাই, হনুমান, রিসাস ম্যাকক, সোনালি শেয়াল, ডোরাকাটা হায়না, বনবেড়াল, চিতাবাঘ, বাঘ, স্লথ ভালুক। ময়ূর, ঝুঁটিওয়ালা সর্প ঈগল-সহ ৩৭০ প্রজাতিরও বেশি পাখি রয়েছে। এই উদ্যানকে ভারতের সেরা বাঘ্র সাফারি বলা হয়।

এসো সংস্কৃত শিখি-১০৭

কতি দ্বারা প্রশ্ন
('কতগুলি' দিয়ে প্রশ্ন)

অভ্যাসং কুর্মঃ –

কতি দন্তাঃ সন্তি ?
কতগুলি দাঁত আছে?

কতি বালিকাঃ সন্তি ?
কতগুলি বালিকা আছে?

কতি ছাত্রাঃ পঠন্তি ?
কতগুলি ছাত্রী পড়ছে?

কতি পুস্তকানি সন্তি ?
কতগুলি বই আছে?

কতি লেখন্যঃ সন্তি ?
কটি কলম আছে?

কতি দ্বারা প্রশ্ন কুর্বন্তু।
কতি দিয়ে প্রশ্ন করার চেষ্টা করব।

ভালো কথা

মৌমাছি

আমাদের বাড়িতে একটি জামগাছ আছে। ঠাকুমা বলে ক'বছর আগেও অনেক জাম হতো। এখন ফুল আসে কিন্তু জাম ধরে না। বাবা বলে এখন মৌমাছি নেই। তাই পরাগ মিলন হয় না, তারফলে ফুল এলেও ফল হয় না। এবারও গাছভর্তি ফুল এসেছে। সেদিন গাছের নীচে গিয়ে দেখি, ফুলে ফুলে মৌমাছি উড়ে বেড়াচ্ছে। মনটা আনন্দে নেচে উঠল। দৌড়ে গিয়ে বাবাকে বললাম সেকথা। বাবা এসে উপরের দিকে দেখিয়ে বললেন, দেখ। আমি তাকিয়ে দেখি, একটা মোটা ডালে মৌমাছি চাক বেঁধেছে। বড়ো চাক। বাবা বললেন, গতকাল বিকেলে ওরা চাক বেঁধেছে। আমি কালই দেখেছি। এবার কিন্তু প্রচুর জাম হবে বুঝলি। আনন্দে আমার মনটি নেচে উঠল।

পূজা মহান্তি, সপ্তমশ্রেণী, বরাবাজার, পুরুলিয়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) অ মৃ ল ত্যু	(১) ত আ ড়ো ই বু ভা
(২) ভা আ স ই	(২) ধ হি সা অ ত ন

২৩ মার্চ সংখ্যার উত্তর
(১) চরণামৃত (২) চিন্তাজনক

২৩ মার্চ সংখ্যার উত্তর
(১) চিন্তাভারাক্রান্ত (২) জঙ্গলমহল

(১) হৃতিকা মণ্ডল, জয়শ্রী, বাঁশদ্রোণী, কল-। (২) কৃতিকা মণ্ডল, মকদুমপুর, মালদা। (৩) মৌমিতা দেবনাথ, নিমতা, কল-৪৯। (৪) পূজা সরদার, ক্যানিং, দঃ ২৪ পরগনা

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/ সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪ ৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.
74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0550. Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রুপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT 8240685206
9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

সঙ্ঘ শতবর্ষের আলোকে কিছু স্মৃতিচারণ

কঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

পরম পূজনীয় গুরুজীর সময়ে সঙ্ঘ বিশালরূপ ধারণ করে এবং সমাজের সর্বস্তরে সঙ্ঘের আদর্শ বিস্তারের জন্য বিবিধ ক্ষেত্রের কাজ তাঁর প্রেরণায় শুরু হয়। স্বামী অখণ্ডানন্দের প্রভাব তাঁর জীবনে লক্ষ্য করা যায়। সবসময় তাঁর মধ্যে আধ্যাত্মিকতার প্রকাশ লক্ষ্য করা যেত। তার জন্যই তিনি স্বয়ংসেবকদের শ্রদ্ধাবিন্দুতে অবস্থিত ছিলেন।

১৯৬৮ সালে নাগপুরে তৃতীয় বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গে গিয়েছি। এক বৈঠকে কর্ণাটক থেকে আগত একজন স্বয়ংসেবককে শ্রীগুরুজী জিজ্ঞেস করলেন, বেলগাঁও জেলা মহারাষ্ট্রের মধ্যে না কর্ণাটকের মধ্যে যাওয়া উচিত? উত্তরে ওই স্বয়ংসেবক বলল যে, বেলগাঁও জেলা কর্ণাটকের মধ্যে যাওয়া উচিত। শ্রীগুরুজী অসন্তুষ্ট হয়ে ওই স্বয়সেবককে বললেন যে, ভারতমাতাকে বৈভবের শিখরে নিয়ে যেতে হলে কোনোপ্রকার প্রাদেশিকতার ভাব থাকা চলবে না।

শ্রীগুরুজী তখন কলকাতায় প্রবাসে এসেছেন। তিনি শুনলেন, এক কার্যকর্তা কেক কেটে তার জন্মদিন পালন করেছেন। শুনে গুরুজী অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। বুঝিয়ে দিলেন যে আমাদের মনে-প্রাণে হিন্দু হতে হবে। এখন আমরা অনেকে ধুতি ছেড়ে সাহেব হয়েছি। আমার মনে হয় আমরা যদি আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য মনে রাখতে না পারি তাহলে আত্মবিস্মৃত জাতি হিসেবে থেকে যাব। কীভাবে আমরা উন্নতির শিখরে যাবো ও বিশ্বকে পথ দেখাবো?

বেলডাঙ্গায় একমাসের সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ চলছিল (১৯৬৯)। বর্গে শ্রীগুরুজীর ভাষণ চলছিল। ভাষণ চলাকালীন প্রবল ঝড়-বৃষ্টি শুরু হলো। ঝড়ের কারণে একটি বাঁশ খুলে গিয়ে ঠিক তাঁর মাথার উপরে দুলছিল। তিনি তাঁর ভাষণ থামালেন না। যেন কিছুই হয়নি। কোনো পরিস্থিতিতে তিনি কখনো বিচলিত হতেন না। স্বয়ংসেবকরা নিষ্ঠাসহকারে তাঁর ভাষণ শুনছিলেন। বসে থাকা স্বয়ংসেবকদের পাশ দিয়ে জলের স্রোত বয়ে যাচ্ছিল। স্বয়ংসেবকরা স্থির হয়ে বৃষ্টির মধ্যে ভাষণ শুনছিলেন। অপূর্ব একাগ্রতা সকলের মধ্যে লক্ষ্য করেছিলাম।

একবার মালদহ থেকে শ্রীগুরুজীকে নিয়ে

শ্রীগুরুজী

একনাথ রাণাডে

গোঁসাইজী (শুভনারায়ণ গিরি) নৌকা করে গঙ্গানদী পার হয়ে রাজমহল যাচ্ছিলেন। বর্ষায় নদীতে ভীষণ জল। নৌকা যেকোনো সময় ডুবে যেতে পারে। তার জন্য গোসাইজী খুব চিন্তিত ছিলেন। কিন্তু শ্রীগুরুজী নির্বিকার। এই হচ্ছে নিষ্কামযোগী শ্রীগুরুজী।

আমি তখন মেদিনীপুরে সঙ্ঘের প্রচারক। অখিল ভারতীয় অধিকারীরা খড়্গপুর রেলস্টেশন হয়ে যেতেন। সেই সময় শ্রীগুরুজী খড়্গপুর স্টেশনের ওপর দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। আমি ও কয়েকজন কার্যকর্তা স্টেশনে চা নিয়ে দেখা করতে গেছি। কথাপ্রসঙ্গে তাঁকে তাঁর বাঁ- হাত কীরকম আছে জিজ্ঞেস করলাম। সেই সময় তাঁর শরীর ভালো যাচ্ছিল না। তিনি বললেন 'পাঁচ অঙ্গুলিয়াঁ জ্যায়সা হ্যায়' মহাপুরুষদের একটি কথার অনেক মানে হয়। তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে পাঁচ আঙুল যেমন সমান হয় না, সেইরকম শরীর সবসময় সমান থাকে না। এরই মধ্যে আমাদের কাজ করতে হবে। এগিয়ে যেতে হবে।

একটি বৈঠকে নাগপুরে গিয়েছিলাম। তখন একজন সঙ্ঘচালক বললেন যে শ্রীগুরুজীর ভাষণের উপরে ইংরেজি 'Bunch of Thoughts' বইটি প্রকাশিত হয়েছে। ওই বইটিতে কোনো ভুল আছে কিনা তা শ্রীগুরুজীকে জিজ্ঞাসা করা হলো। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীগুরুজী বইটি একবার দেখে নিয়ে বলে দিলেন কোথায় কোথায় ভুল আছে। কী অসম্ভব ক্ষমতা! অবাক হয়ে যাবার মতো।

কলকাতায় ঘনশ্যাম বেরিওয়ালার বাড়িতে শ্রীগুরুজী প্রচারকদের বৈঠক নিচ্ছেন। সেই বৈঠকে অমলদা, রবীনদা, শ্যামমোহনদা প্রমুখ প্রচারক ছিলেন। আমি তখন সঙ্ঘের প্রচারক, তাই আমারও থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল। শ্যামমোহনদা ঘরের এক কোণে বসেছিলেন। একজন প্রচারক রসিকতা করে বললেন যে শ্যামমোহনদা 'কর্নার' হয়ে গেছেন। শ্রীগুরুজী সঙ্গে সঙ্গে বললেন যে শ্যামমোহনদা 'কর্নার স্টোন'। কী সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিলেন। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্ঘের কাজকে যারা এগিয়ে নিয়ে চলেছেন তাঁদের মধ্যে শ্যামমোহনদা একজন। শ্রীগুরুজী সত্যিই তাঁর সঠিক মূল্যায়ন করেছেন। তার সঙ্গে তাঁর রসবোধ লক্ষ্য করার মতো।

অসমে তখন বাঙ্গালি হিন্দুদের উপর মুসলমানরা অত্যাচার করছিল। ফলে অনেক হিন্দু বাঙ্গালি অসম ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। সেই সময় শ্রীগুরুজী নাগপুরে ছিলেন। নিজের ঘরে শুধু পায়চারি করছিলেন আর বলছিলেন 'পুরব জ্বল রহা, পুরব জ্বল গয়া'। কী অসামান্য অনুভূতি ও সহানুভূতি। চিন্তা করলে অবাক হতে হয়, তাঁর মতো অসামান্য ব্যক্তিত্ব, অসামান্য প্রতিভা, উচ্চকোটির সাধক ও দেশপ্রেমিক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক ছিলেন। তিনি নেই, তবে আমার বিশ্বাস যে, তিনি সূক্ষ্মদেহে আমাদের মধ্যে বিচরণ করছেন এবং আমাদের চিরকাল পথনির্দেশ করে যাবেন।

১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশে পরিণত হয়েছে। সেই সময় শ্রীগুরুজী কলকাতার ময়দানে ভাষণের সময় বললেন, 'পাকিস্তান কা বাকিস্তান হ্যায়' অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তান রইল, পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশে পরিণত হয়েছে। এই কথার মধ্যে ইঙ্গিত হলো ভবিষ্যতে পশ্চিম পাকিস্তান রইবে না। আর এক জায়গায় বলেছিলেন, 'যবতক পাকিস্তান তব তক অশান্তি।' যতদিন পাকিস্তান রইবে ততদিন অশান্তি থাকবে। একদম সত্য কথা। যার ফল আজও আমরা ভুগছি।

মনে পড়ে একনাথ রাণাডের কথা। একনাথজীর এক সময় কলকাতায় কেন্দ্র ছিল। পরে তিনি সহ সরকার্যবাহ হন। তারপর তিনি বিবেকানন্দ কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। মাত্র ছ'মাসের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা-সহ স্বামীজী বিষয়ক সব বই পড়ে ফেলেন। কী অসম্ভব ক্ষমতা! তারপর তিনি স্বামী বিবেকানন্দের উপর 'Rousing Call to Hindu Nation' বইটি লিখলেন। এই বইটি পরবর্তীকালে সব ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। তাঁরই প্রচেষ্টায় লোকসভার অধিকাংশ সদস্য এবং তৎকালীন রাষ্ট্রপতি কন্যাকুমারীতে 'বিবেকানন্দ রক মেমোরিয়াল' তৈরিতে সহযোগিতা করেছেন। আমরা স্বয়ংসেবকরা সব জায়গায় গিয়ে মানুষের কাছে স্বামী বিবেকানন্দের উপর পুস্তিকা দিয়েছি এবং তার সঙ্গে ১ টাকার কুপন বিক্রি করেছি। ১ টাকার কুপন করার অর্থ হলো যাতে এই কর্মযজ্ঞে সকলের ভূমিকা থাকে। বিবেকানন্দ কেন্দ্রের কর্মধারা আজও অব্যাহত। তারফলে বিভিন্ন জায়গায় সঙ্ঘের কাজের বিস্তার করা সম্ভব হয়েছে।

১৯৬২ সালে বর্ধমানের মহন্তস্থলে প্রথম বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গে অংশগ্রহণ করেছি। সেই সময় পশ্চিমবঙ্গ, অসম ও ওড়িশার স্বয়ংসেবকরাও অংশগ্রহণ করেছিল। একনাথজী আমাদের বৈঠক নিচ্ছিলেন। সকলের নাম, শাখা ইত্যাদি জিজ্ঞেস করছিলেন। পরিচিত হবার পর জিজ্ঞেস করলেন, কার মনে হচ্ছে যে তার নাম আমার মনে নেই। কয়েকজন হাত তুলল। সঙ্গে সঙ্গে একনাথজী তাদের নাম বলে দিলেন। আমরা প্রায় ৩০০ জন ছিলাম। অতজনের নাম একবার মাত্র শুনে মনে রেখেছেন। কী অসাধারণ স্মৃতিশক্তি!

কলকাতায় হাতিবাগানের কাছে ৭৬/১, বিধান সরণী, কলকাতা-৬ এর তিনতলায় বিবেকানন্দ কেন্দ্রের কার্যালয় রয়েছে। সেখানে এক সময় একনাথজীর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তিনি জানলেন যে আমি মালদার স্বয়সেবক; তখন তিনি নাড়ুদা, অজিতদা প্রমুখর নাম জিজ্ঞেস করেছিলেন। বহু বছর আগে তাঁদের সঙ্গে একনাথজীর পরিচয় হয়েছিল। এতবছর পরে তিনি তাঁদের ভুলে যাননি শুনে ভালো লাগল। তাঁর স্মৃতিশক্তির পরিচয় পেয়ে অবাক না হয়ে থাকতে পারিনি।

মনে পড়ে দত্তোপন্থ ঠেংড়ীজীর কথা। তিনি বেলডাঙ্গার সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গে (১৯৬৯) এসেছিলেন। তিনি একদিন ভাষণে বললেন যে কনিউনিস্টরা শেষ হয়ে যাবে। সেই সময় সিপিএমের প্রচণ্ড প্রভাব। সত্যিই আজ তাদের খুঁজে পাওয়া যায় না। বিশ্বের মানচিত্রে ম্লান হয়ে গেছে কমিউনিস্টরা। কী দূরদৃষ্টি, কী পড়াশোনা, ভাবতে অবাক লাগে। সেইরকমই ব্যক্তিত্ব, মিষ্টভাষী ও দক্ষ সংগঠক। তিনি ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা। মজদুর সঙ্ঘ আজ দেশের একনম্বর শ্রমিক সংগঠন। তাঁর মতো প্রতিভাধর ব্যক্তির অভাব আমরা প্রতি মুহূর্তে অনুভব করি।

মনে পড়ে মোরপন্থ পিঙ্গলেজীর কথা। তিনি অখিল ভারতীয় শারীরিক প্রমুখ ছিলেন এবং সঙ্ঘের দক্ষ প্রচারক ও সংগঠক। তিনি এমনভাবে রসিকতা করে বলতেন যে প্রচারক ও স্বয়ংসেবকরা না হেসে থাকতে পারতেন না। একটি ঘটনার কথা বলেন। একজন প্রচারক প্রবাসে গিয়েছেন। রাত্রিবেলা তাঁকে কাপে করে দুধ দেওয়া হয়েছিল। তিনি এক ঘটি দুধ পান করেন। কম দুধে অভ্যস্ত নন। তিনি বললেন 'মেরা কান মে ডাল দো'। এই বলেই শ্রীগুরুজী হেসে উঠলেন। আমরাও হাসলাম।

একবার পিঙ্গলেজী প্রচারকদের বৈঠক নিচ্ছিলেন। শুনলেন যে পরপর দুটো উৎসবের সময় দু'জন প্রচারক দেহ রেখেছেন। তিনি বললেন যে প্রচারকরা সাবধান, এরপরে হয়তো তোমরাও কেউ মৃতদেহ হয়ে আসতে পার। এমনভাবে বললেন যে প্রচারকরা না হেসে থাকতে পারলেন না।

পিঙ্গলেজী সেই বর্গে বলছিলেন, কার্যকর্তাদের সমাজের সর্বস্তরে যোগাযোগ রাখতে হবে, যাতে তাদের কথা কেউ ফেলতে না পারে। উদাহরণস্বরূপ বললেন— একবার এক শাখার মুখ্য শিক্ষককে বলা হলো, কাল তোমাদের শাখায় জেলা কার্যবাহ আসবেন। তোমার শাখায় একশো সংখ্যা রাখতে হবে। ছোটো শাখা। প্রতিদিন কম সংখ্যা হতো। কিন্তু দেখা গেল, পরদিন কার্যবাহের উপস্থিতিতে ১০০ জন শাখায় এসেছে। পরে একবার আবার ওই মুখ্যশিক্ষককে বলা হলো প্রান্ত স্তরের কার্যকর্তা আসবেন,

স্বস্তিকার বিজ্ঞাপনের দরপত্র (এক সপ্তাহের জন্য)

Back Cover	(Multi Colour)	Rs. 32,000.00
Front Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Back Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Full Page	(Multi Colour)	Rs. 20,000.00
Full Page	(Black & White)	Rs. 15,000.00
Half Page	(Black & White)	Rs. 8,000.00
Qtr. Page	(Black & White)	Rs. 4,000.00

*** বিজ্ঞাপনের টাকা জমা পড়লে বিজ্ঞাপন ছাপানো হবে।*

যোগাযোগ — মো : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

তোমার শাখায় হাজার সংখ্যা রাখতে হবে। দেখা গেল প্রান্তকার্যবাহের উপস্থিতিতে হাজার সংখ্যা হয়েছে। গ্রামশুদ্ধ লোক মাঠে চলে এসেছে। একজন বিরোধী রাজনৈতিক দল করতো সেও এসেছে। এটা সম্ভব হলো কারণ এই গ্রামের সকলের সঙ্গে মুখ্যশিক্ষকের মধুর সম্পর্ক ছিল। সকলের সুখ-দুঃখের অংশীদার ছিল। তাই অসম্ভবকে সম্ভব করতে পেরেছে। পিঙ্গলেজীর এই কথাগুলো আজও মনে আছে। তাঁর ভাষণ কেউ ভুলতে পারে না। এরকম ছিল তাঁর দক্ষতা।

১৯৮৩ সালে ভারতজুড়ে একাত্মতা রথযাত্রার পরিকল্পনা তাঁরই মস্তিষ্কপ্রসূত। পূজনীয় শঙ্করাচার্য থেকে সমাজের সকলে তাতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ওই রথযাত্রা সারা ভারতে খুব সাড়া জাগিয়েছিল এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ এই যাত্রায় যোগদান করেছিলেন।

মানুষ আজ হাসতে ভুলে গেছে। পিঙ্গলেজী হাসতে হাসতে জীবন সংগ্রামকে আনন্দময় করে তুলতেন। অনেক কঠিন পরিস্থিতিতেও হাসির মাধ্যমে পথনির্দেশ করতেন। পিঙ্গলেজীর কথা প্রতি মুহূর্তে অনুভব করি।

মনে পড়ে তৃতীয় সরসঙ্ঘচালক বালাসাহেব দেওরসজীর কথা। তিনি বলতেন যে, সঙ্ঘের কার্যকর্তাদের বিশেষ করে সঙ্ঘের প্রচারকদের সবকিছু জানতে হবে। এক সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গের কথা। বালাসাহেবজী রন্ধনবিভাগে ছিলেন। ওই সময় তাঁকে বৌদ্ধিক বিভাগ থেকে ভাষণ দেবার জন্য ডাকা হলো। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এসে হাত-পা না ধুয়ে ওই অবস্থায় ভাষণ দিতে আরম্ভ করলেন। পরমপূজনীয় ডাক্তারজী সকলকে সমাজের কাজে সেভাবেই উপযুক্ত করে তুলেছেন। আমরা পুরাতন প্রচারকদের দেখেছি, তাঁরা যেমন ভাষণ দিতেন, সেরকমই শারীরিক নিতেন, সেরকমই গান করতে পারতেন। সবকাজে তাঁরা পারদর্শী ছিলেন। বালাসাহেবজীকে আমরা জানি যে প্রথমে সরকার্যবাহ, পরে তৃতীয় সরসঙ্ঘচালক হন। তিনি সব সমস্যার সুন্দর সমাধান করতেন। সঙ্ঘের কাজ বিশালরূপ হওয়ার তিনি একজন অন্যতম কারিগর।

মনে পড়ে তাঁর ভাই ভাউরাওজীর কথা। সেই সময় তিনি ক্ষেত্রের দায়িত্বে ছিলেন। এক প্রচারক বৈঠকে তিনি বললেন যে, প্রচুর পরিমাণে প্রচারক বের করা দরকার। সংগঠনের সর্বস্তরে কার্যকর্তার

অমল কুমার বসু

কেশব রাও দীক্ষিত

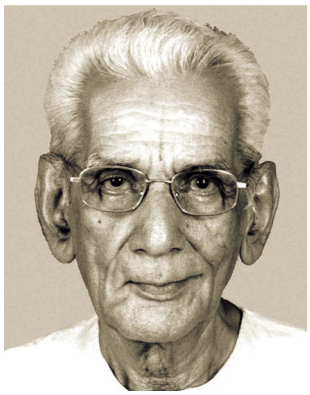

অনন্তলাল সোনী

প্রয়োজন। অর্থাৎ কাউকে বাদ দেওয়া নয়। বয়সের জন্য বা শিক্ষার জন্য কাউকে বাদ দেওয়া চলবে না। অটলবিহারী বাজপেয়ী আগে সঙ্ঘের সম্ভাগ প্রচারক ছিলেন। পরে শ্রীগুরুজী তাঁকে জনসঙ্ঘে দেন। অটলজীকে সঙ্ঘে নিয়ে আসেন ভাউরাওজী। ভাউরাওজীও দক্ষ সংগঠক ছিলেন। সকলকে সঠিক পথনির্দেশ করতেন। সমস্যার সমাধান সহজভাবে করতে পারতেন।

মনে পড়ে অমলদার কথা (অমলকুমার বসু)। তিনি পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তপ্রচারক ছিলেন। তাঁর প্রেরণায় মালদহ থেকে অহীন্দ্র কুমার দে, ও ভুবনেশ্বর দাস-সহ বেশ কয়েকজন প্রচারক হিসেবে বের হন। পরবর্তীকালে অমলদা প্রান্তকার্যবাহ ও প্রান্ত সঙ্ঘচালক এবং বিবিধ ক্ষেত্রের দায়িত্ব পালন করেছেন। অকৃতদার ছিলেন। শ্রীগুরুজীর তিনি খুব প্রিয় ছিলেন। বংশীদা অমলদাকে খুব শ্রদ্ধা করতেন।

মনে পড়ে বসন্তদার কথা। বসন্তরাও ভট্টকে দেখে খুব উৎসাহ পেতাম। মেদিনীপুর কার্যালয়ে আমি প্রচারক থাকাকালীন দেখেছি প্রতিদিন তিনি ১৩টি সূর্য নমস্কার করতেন। তখন মনে হতো তাঁর শরীর থেকে জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। তাঁকে দেখে আমি প্রেরণা পেয়েছি। অসামান্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। ছিলেন মিষ্টভাষী। কথা কম বলতেন এবং কাজ বেশি করতেন। তিনি আমাদের প্রান্ত প্রচারক ছিলেন। তাঁর সময় পশ্চিমবঙ্গে সঙ্ঘকাজের বিস্তার ঘটে। তিনি খুব ভালো সংগঠক ছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁকে বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের দায়িত্ব দেওয়া হয়। পূর্ব ভারতে বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের ভিত তৈরি করেছেন তিনি।

মনে পড়ে কেশবজীর (কেশবরাও দীক্ষিত) কথা। তিনি প্রথমে কলকাতা পশ্চিম ভাগ প্রচারক ছিলেন। পরে মহানগর প্রচারক হন। তারপরে প্রান্ত প্রচারক হন। আমি যখন ১৯৬৫ সালে বর্ধমানের মহন্তস্থলে দ্বিতীয় বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ করি, তখন কেশবজী আমাদের চর্চাপ্রমুখ ও গণপ্রমুখ ছিলেন। ওই চর্চায় মেদিনীপুরের লহর মজুমদার, কলকাতার দেবাশিস লাহিড়ী প্রমুখ ছিলেন। কেশবজী খুব মিষ্টভাষী ছিলেন। ভালো গান করতে এবং সুন্দর ভাষণ দিতে পারতেন। তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন। সকলে তাঁকে ভালোবাসতো ও শ্রদ্ধা করতো। কলকাতার জ্ঞানীগুণীদের উপর তাঁর খুব প্রভাব ছিল। তাঁর কথা কেউ অমান্য করতে পারতো না। ডঃ ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তীর মতো বহু গুণী মানুষকে সঙ্ঘে নিয়ে এসেছিলেন।

২৬নং বিধান সরণী সঙ্ঘকার্যালয়ে 'ভগবান' বলে একজন রান্না করতো। ভগবানকে বলতে শুনেছি কেশবজী মানুষ নন, তিনি ভগবান। কেশবজীকে বলতে শুনেছি যে পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র মহাবীর শ্রীহনুমানের পূজা হওয়া দরকার। তিনি

মহারাষ্ট্র থেকে কলকাতায় এসেছিলেন। কলকাতাতেই তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁকে প্রণাম জানাই।

মনে পড়ে মাধবদার (মাধবরাও বনহাট্টী) কথা। তিনি সম্ভাগ প্রচারক ছিলেন। খুব শৃঙ্খলাপরায়ণ ছিলেন। কোনোদিন ১৩টি সূর্যনমস্কার ও শরীর চর্চা করতে ভুলতেন না। তাঁর শৃঙ্খলাপরায়ণতা আমাকে খুব আকৃষ্ট করেছিল।

মনে পড়ে অন্তদার (অনন্তলাল সোনী)-কথা। তিনি নিঃশব্দে সকলের আড়ালে থেকে কাজ করে যেতেন। তিনি প্রচারবিমুখ ও আধ্যাত্মিকসম্পন্ন ছিলেন। আমি মেদিনীপুরে প্রচারক থাকাকালীন তিনি বিভাগ প্রচারক (হাওড়া, হুগলী, মেদিনীপুর জেলা) ছিলেন। একবার কারও সঙ্গে সম্পর্ক হলে তার সঙ্গে সারাজীবন যোগাযোগ রাখতেন। তিনি দ্বারহাট্টা কলেজের প্রিন্সিপাল ব্রহ্মচারী জ্যোতির্ময় চৈতন্য-সহ অনেককে সঙ্ঘের মধ্যে নিয়ে এসেছেন। তাঁরা নিষ্ঠা সহকারে সঙ্ঘের কাজ করেছেন। তিনি বলতেন, 'one life one mission'। সঙ্ঘ ছাড়া জীবনে তাঁর কিছু ছিল না। তাই জীবনের শেষ অবধি সঙ্ঘের কাজ করেছেন। তাঁর প্রেরণায় অনেক প্রচারক বেরিয়েছে। তাঁর পরিবারের সব ভাই স্বয়ংসেবক ও কার্যকর্তা ছিলেন। প্রচারক বংশীলাল সোনী যে তাঁর ভাই তা আমরা সকলে জানি।

অনন্তদা যে কাজ হাতে নিতেন তা খুব নিষ্ঠাসহকারে করতেন। আমি মেদিনীপুরে প্রচারক থাকাকালীন অনন্তদা মেদিনীপুর নগরে আসতেন। একদিন ছোটো বাজারের কার্যালয়ে আমি ও অনন্তদা বসেছিলাম। তখন কার্যালয়ে ঢুকছিলেন মনোদা। তাকে দেখে অনন্তদা দুই হাত জোড় করে প্রণামের ভঙ্গিতে নমস্কার করলেন। তা দেখে আমি অবাক। অনন্তদাকে বললাম যে মানোদা আপনার থেকে অনেক ছোটো। প্রণাম করলেন কেন? অনন্তদা বললেন, 'মনোদার বিয়ে হয়ে গেছে। বিয়ে হলে মানুষের নিজের বয়স + স্ত্রীর বয়স + ১০ বছর যুক্ত হয়। সেইজন্য মনোদা আমার চেয়ে বড়ো।' তাঁর ওই যুক্তি শুনে খুব হাসলাম। ভালো রসিকতা করতে পারতেন।

তিনি কার্যালয়ে বসে অনেককে দিয়ে চিঠি লেখাতেন, শেষে নিজে An Ant লিখে স্বাক্ষর করতেন। অনন্ত নামকে একসঙ্গে না লিখে An Ant লিখতেন। তার মানে একটি পিঁপড়া চিঠি লিখছে। না হেসে থাকতে পারলাম না। বেশ রসিক বটে। তবে তিনি গম্ভীরভাবে রসিকতা করতেন। An Ant বলার সঙ্গে তাঁর বিনয়ও প্রকাশ পেত।

একবার আমি ও অনন্তদা জেলা সঙ্ঘচালক জীবন জানার বাড়ির দিকে যাচ্ছি। শক্তি ঠাকুর আমাদের সঙ্গে ছিল। অনন্তদা শক্তিকে সাইকেলে করে তাড়াতাড়ি জীবন জানার বাড়িতে খবর দিতে বললেন। শক্তি সাইকেল চালাতে জানত না। শুনে অনন্তদা শক্তিকে এমনভাবে বললেন যাতে শক্তির স্বাভিমানে লাগে। ফলে শক্তি তারপরের দিনই সাইকেল চালানো শিখে নিয়েছিল। শক্তি ঠাকুর এখন বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের পূর্ণকালীন কার্যকর্তা। শক্তি একবার কোনো গান শুনলে তা সঠিকভাবে মনে রেখে সুন্দরভাবে গাইতে পারতো। ওর মধ্যে অনেক প্রতিভা রয়েছে। মেদিনীপুর নগরে ভাণ্ডারী শাখাটি বন্ধ ছিল। ওই শাখাটি শুরু করা যাচ্ছিল না কিছুতেই। শক্তিকে আমি ওই শাখা শুরু করতে পাঠালাম। ও সুন্দরভাবে ভাণ্ডারীতে শাখা শুরু করেছিল। ভালোই সংখ্যা হতো। ও অসম্ভবকে সম্ভব করার মতো ক্ষমতা রাখে। বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের অখিল ভারতীয় সহকারী খেলকুদ প্রমুখের দায়িত্বও পালন করেছে। অনন্তদার হাত দিয়ে অনেক প্রচারক বের হয়েছে।

সুধাময় দত্ত, লক্ষ্মী সেন, ডাঃ শম্ভুনাথ ধারা, ডাঃ শচীন সিংহ, সুধাংশু পাত্র, শঙ্কর বাগ আমার মেদিনীপুরে থাকার সময়ে প্রচারক বের হয়। শক্তি ঠাকুর বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের পূর্ণকালীন কার্যকর্তা হিসেবে যোগদান করে। শঙ্কর বাগ ও সুধাময় দত্ত আর ইহজগতে নেই। এদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল। শঙ্কর বাগের সঙ্গে কিছুদিন আগে কথা হয়েছিল। সুধাময়, শম্ভু, শচীন, শঙ্কর এরা বিবেকানন্দ শাখায় যেত। প্রবীর গাঙ্গুলীর সঙ্গে এদের যোগাযোগ ভালো ছিল। একদিন অনন্তদার সঙ্গে সুধাময়দের বাড়ি বেলুনে যাই। ওর মা-বাবার সঙ্গে পরিচয় হয়। সুধাময়দের মেদিনীপুর শহরে একটি বাড়ি আছে। ওর ভাই স্নেহময় ওই বাড়িতে থাকেন। সুধাময়কে প্রথমে শালবনীতে বিস্তারক পাঠাই। ওখান থেকে ও প্রচারক বের হয়। প্রথমে শ্রীরামপুর নগর এবং পরে মালদায় জেলা প্রচারক হিসেবে আসে। মালদায় খুব ভালো কাজ করেছে। খুব পরিশ্রমী ছেলে। মালদার গ্রামে বিশেষত কালিয়াচকে সঙ্ঘশাখা ওর হাত দিয়েই শুরু হয়, তা পরবর্তীতে বিস্তার লাভ করে।

সুধাংশু পাত্র মেদিনীপুর কৈবল্যদায়িনী কলেজে B.Com. Hons নিয়ে পড়ত। তখন ওর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। মেদিনীপুর নগরের ধর্মাতে ওকে সবাই 'মাস্টারদা' বলে ডাকত। ওকে সকলে ভালোবাসত ওর সুন্দর ব্যবহারের জন্য। ওকে ধর্মার পাশে সরাসরি একটি শাখার কার্যবাহ ঘোষণা করি। ওই শাখার মুখ্যশিক্ষক হিসেবে আশিসকে দায়িত্ব দিই। আশিস তার আগে কেশরী শাখায় যেত।

একবার দীঘার পাশে একটি উচ্চবিদ্যালয়ে আমাদের প্রাথমিক বর্গ চলছিল। ওই বর্গে বসন্তদা ভাষণ দেন। অনন্তদা, ধর্মদাও ছিলেন। ওই বর্গেই সুধাংশু সঙ্ঘের প্রচারক হবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। ওকে আমি অনন্তদার কাছে নিয়ে যাই। সুধাংশুকে প্রচারক হিসেবে কান্দী মহকুমার দায়িত্ব দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রান্তের হিসাবরক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। তারপরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সেবা বিভাগের ক্ষেত্রের দায়িত্ব পালন করে। এখনও কাজের মধ্যে আছে।

ডাঃ শচীন সিংহ তখন ডিএমএস নিয়ে হোমিওপ্যাথি কলেজে পড়ত। ছাত্রাবাসে থাকাকালীন বিবেকানন্দ শাখায় রোজ যেত। পরবর্তীকালে সঙ্ঘের প্রচারক বের হয়। একসময় মালদায় বিভাগ প্রচারক হিসেবে আসে। প্রদেশের প্রচার প্রমুখের দায়িত্বও পালন করে। তারপরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ক্ষেত্রীয় ও অখিল ভারতীয় দায়িত্ব পালন করে। এখন অবধি ও কাজের মধ্যে আছে। ডাঃ শম্ভুনাথ ধারা খুব উৎসাহী ছেলে। মেদিনীপুর হোমিওপ্যাথি কলেজে পড়ত। একটি কলেজ ছাত্রদের ট্রিপে আমরা কলেজ ছাত্রদের নিয়ে মেদিনীপুর নগর থেকে সাইকেলে কাঁথি হয়ে

দীঘা যাই। সেই ট্রিপে শম্ভুও ছিল। ও পরে প্রচারক বের হয়। বীরভূমে মল্লারপুরে প্রচারক হিসেবে কয়েকবছর থাকে। ওর সঙ্গে কিছুদিন আগে ফোনে কথা হয়েছে। ওই প্রথম শঙ্করের পরলোকগমনের কথা আমাকে জানায়।

শঙ্কর, শচীন, শম্ভু, সুধাময়ের সঙ্গে মেদিনীপুর নগরের প্রবীর গাঙ্গুলীর ভালো যোগাযোগ ছিল। ছাত্রবাসে এরা থাকতো। প্রবীরের বাড়ির পাশে এরা থাকতো। সঙ্ঘকার্য বিস্তারে প্রবীর ভালো সাহায্য করেছিল।

রথীনদা (চক্রবর্তী) মেদিনীপুর জেলা থেকে চলে যাবার পর আমি মেদিনীপুর নগরে যাই। রথীনদার সময়ে স্বপন সরকার ও আরও কয়েকজন সঙ্ঘের প্রচারক বের হয়। অনন্তদার ভালোবাসা ছিল গভীর। আমি প্রচারক থেকে বাড়ি ফিরে এলে আমার সঙ্গে দেখা করতে আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন। বুঝেছিলাম তিনি কতটা আমায় ভালোবাসেন। বিশেষ করে আমার মাতৃবিয়োগের পর তিনি আমাকে চিঠি লেখেন। তা আজও মনে আছে।

মেদিনীপুরের লহরদা, কনক, প্রবীর, ভোলা, মণি, অমিত, সুমিত, দীপক, সুধাময়, শম্ভু, সুধাংশু, শক্তি, শচীন, তিলক, চন্দন, অদ্বৈত আরও অনেকের কথা মনে পড়ে। অদ্বৈত দত্তের সঙ্গে মেদিনীপুরের চাকুলিয়ায় প্রাথমিক বর্গে দেখা হয়। ও তখন স্কুলে পড়ত। মাদপুরের স্বয়ংসেবক। ওকে দেখে বুদ্ধিমান মনে হলো, তাই ওর সঙ্গে আমি কথাবার্তা বললাম। আজও সে দৃশ্য মনে আছে। পরে ও মেদিনীপুর কলেজে পড়াশোনা করতো। পড়াশোনা শেষ করে সঙ্ঘের প্রচারক বের হয়। এখন অবধি সঙ্ঘের প্রচারক হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। অখিল ভারতীয় সহ-প্রচারক প্রমুখের দায়িত্ব পালন করেছে। এখন অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার সদস্য। ও সকলের সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার করে এবং সকলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। মেদিনীপুরের প্রচারক থাকাকালীন অনেক অভিজ্ঞতা রয়েছে তার মধ্যে কয়েকটি তুলে ধরলাম।

বংশীদার (সোনী) কথা মনে পড়ে। তিনি প্রত্যেক স্বয়ংসেবকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। তাঁর ভাষণ ছিল যুক্তিপূর্ণ ও প্রেরণাদায়ী। প্রত্যেক স্বয়ংসেবকদের প্রতি ছিল তাঁর লক্ষ্য। বলতেন, স্বয়ংসেবক সবসময় টিপটপ থাকবে। তিনি স্বয়ংসেবকদের শিক্ষকতার পেশা গ্রহণ করতে পরামর্শ দিতেন। সমাজে বিশেষ করে গ্রামে ও মফস্‌সলে শিক্ষকদের এক বিশেষ স্থান রয়েছে এবং শিক্ষকরা সঙ্ঘের কাজে বেশি সময় দিতে পারেন। তাই সঙ্ঘের কাজকে দৃঢ় করতে স্বয়ংসেবকদের শিক্ষকতা করতে বলতেন। তাঁর সময়ে সঙ্ঘের কাজ বিস্তারলাভ করে যা সুন্দর রূপে আমরা দেখতে পাই। তিনি প্রথমে শ্রীরামপুর, পরে শিলিগুড়ি, তারপরে মালদায় আসেন। তিনি পরে উত্তরবঙ্গের সম্ভাগ প্রচারক হন। তারপরে কলকাতা মহানগরের দায়িত্ব নিয়ে যান। মালদার স্বয়ংসেবক সুনীলপদ গোস্বামী কলকাতায় বংশীদার প্রেরণায় প্রচারক বের হয়। সুনীলপদ গোস্বামী মুর্শিদাবাদে জেলা প্রচারকের দায়িত্ব নিয়ে যায়। তাঁর সময়ে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম মুর্শিদাবাদে ১০০ উপর শাখা হয়। তখন মালদা জেলায়ও ১০০ উপর শাখা ছিল।

বংশীদার অনেক কথা বলে শেষ করা যাবে না। মালদায় প্রচারক হিসেবে অনেকে এসেছিলেন। মুরলীধর নায়েক,পাণ্ডুরাম ক্ষীরসাগর, বংশীদা, লক্ষ্মীনারায়ণ ভালা, রামচন্দ্র নাইকওয়াড়ে,রাধাগোবিন্দ পোদ্দার, কালীশঙ্কর চক্রবর্তী, সুধাময় দত্ত, কৃষ্ণব্রত পাঁজা, পার্থ ঘোষ, সুকেশচন্দ্র মণ্ডল, শচীন সিংহ, সুনীল ঘোষ, জলধর মাহাতো, চন্দন সেনগুপ্ত, সিদ্ধার্থ রায়চৌধুরী আরও অনেকে। তাদের আত্মত্যাগ, সেবা ও কর্মদক্ষতা মালদার স্বয়ংসেবকরা চিরকাল মনে রাখবে। মুরলীধর নায়েকের সময় মালদহ নগরের সমস্ত বাড়ি থেকে শাখায় আসত। মুরলীদা স্বয়ংসেবকদের ও সাধারণ হিন্দুদের মনোবল রাখার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম দিতেন, বিশেষ করে মালদা যখন তিন দিন পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে ছিল। তার অনেক ঘটনা নাড়ুদার কাছে শুনেছি। একেকজন প্রচারকের সম্পর্কে লিখলে অনেক বড়ো হয়ে যাবে। পরবর্তীকালে সুযোগ হলে পরিবেশন করবো।

জয়দেবদা, অজিতদা, নারুদা, বিনয়দা, জীবুদা, তুষার ঘোষ, সদাদা, সত্যনারায়ণ মজুমদার, অশোকচাঁদ বর্মন, বিদ্রোহী সরকার, সুব্রত কুণ্ডু, প্রবীর, বুলুদা, কালুদা, ভুলুদা, সুভাষ, অলোক, সুশীল, গোপেশ, সৌরেনদা, দীনেশ, বিভাষ, গৌরী, কালাচাঁদ, বৈদ্যনাথ, সুভাষ দাস, প্রফুল্ল, নকুলদা, গোবিন্দ, নীহার প্রমুখ একেকজন রাষ্ট্রসেবায় নিবেদিত প্রাণ। তাদের কথা স্বল্প পরিসরে লেখা অসম্ভব বলে মনে করি। মালদার সঙ্ঘের কাজে তাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

মনে পড়ে অমলদা, বসন্তদা, কালীদা, কেশবজী, বংশীদা, মাধবদা, শ্যামমোহন দে, শ্যামলালদা, মাস্টারমশায় (কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী), গজাননদা, প্রভাকর লাখে, অনন্তদা, অজিতদা, লক্ষ্মীভালা, কালিদাস সালোড়কর, সজলদা, সুধীদা, ডাঃ চিন্ময় শীল, ডাঃ সুজিত ধর, কেষ্টদা, গৌরাঙ্গদা, অবনীদা, অসিত দে, বিজয় গণেশ কুলকর্ণী, বিজয় আঢ্য প্রমুখর কথা।

আমি দেখেছি সঙ্ঘের প্রচারকদের সময়জ্ঞান, কথার দাম ও আদর্শ জীবন। সঙ্ঘের প্রচারকরা হলেন গৈরিকবিহীন সন্ন্যাসী। যাতে আছে তীব্র বৈরাগ্য ও জীবন লক্ষ্যে পৌঁছাবার একান্ত প্রচেষ্টা। তাদের লক্ষ্য ভারতমাতার হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনা এবং ভারতমাতাকে জগদ্‌গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত করা।

ছোটোবেলা থেকে শুনে এসেছি, সঙ্ঘ হচ্ছে পরিবারভিত্তিক সংগঠন। এটি কিন্তু ফরমাল সংগঠন নয়। এখানে মুখে মুখে কাজ হয়, কাগজ-কলমের দরকার হয় না, যা আমাদের প্রতিটি পরিবারে হয়ে থাকে। পরিবারে যেমন প্রত্যেকের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও আস্থা থাকে যা কোনো গঠনতন্ত্রে বা সংবিধানে লিপিবদ্ধ থাকে না। সঙ্ঘ হচ্ছে এমন একটি সংগঠন যেখানে কাগজ-কলমের দরকার হয় না, থাকে পরস্পরের প্রতি গভীর ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস।

এই সংগঠন বিশ্বের মাঝে অনন্য, যার তুলনা কারও সঙ্গে চলে না। তাই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ বিশ্বের মধ্যে বৃহত্তম সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন। যার ছত্রছায়ায় যে আসবে সে গভীর শান্তি অনুভব করবে, যাতে শুধুই গভীর ভালোবাসা ও বিশ্বাস। সঙ্ঘের কথা বলে বা লিখে শেষ করা যায় না। যার কুলকিনারা পাওয়া যায় না, যা পাওয়া যায় একমাত্র হৃদয়ের অনুভবে। □

ধ্বংসের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের ভোটের ইস্যু এবার একটাই

পশ্চিমবঙ্গের 'সর্বনাশ' হয়ে গিয়েছে। ব্যাস্, এটুকুই। এর বাইরে আসন্ন রাজ্য বিধানসভা ভোটে আর কোনো ইস্যু নেই। ২০১১ সালের রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ৩৪ বছরের ভয়াবহ বাম জমানার অবসান ঘটে। এই পরিবর্তন পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে সদর্থক হবে বলে রাজ্যবাসী আশাপ্রকাশ করলেও পরবর্তী ১৫ বছরে রাজ্যের পরিস্থিতি রীতিমতো শোচনীয় ও দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। ১৫ বছরে তোলামূলি শাসনের শেষে এ রাজ্যে প্রাইমারি, সেকেন্ডারি, হায়ার সেকেন্ডারি মিলিয়ে প্রায় ২০ হাজার স্কুল বন্ধ হয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিকের গণ্ডি পেরিয়ে প্রায় ৬ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী রাজ্যের কলেজগুলিতে গ্র্যাজুয়েশন কোর্সে ভর্তি হয়নি। গত ১৫ বছর ধরে রাজ্য সরকার পরিচালিত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালগুলিতে স্থায়ী ডাক্তার নিয়োগ হয়নি। তোলামূলি রাজত্বে মেডিক্যাল কলেজে কর্মরত অবস্থায় ডাক্তার নিহত হন; মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রী রাজনৈতিক নেতাদের হাতে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়, আইন কলেজে ছাত্রীর সম্ভ্রমহানি হয়, এমবিএ ছাত্রী নির্যাতিতা হয়ে রাজ্য ছাড়ে, রাজ্যের ৮৫ লক্ষ যুবক-যুবতী বেকার ভাতার জন্য লাইনে দাঁড়ায়। সরকারি চাকরি, জয়েন্ট এন্ট্রান্স বা নিট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য ইংরাজি, অঙ্ক-সহ বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় শিখতে এরাজ্য থেকে হাজার হাজার ছেলে-মেয়ে রাজস্থান যাচ্ছে, হাজার হাজার রোগী ডাক্তার দেখাতে যাচ্ছে চেন্নাই, ভেলোর, ভাগ্যনগর। এ রাজ্যের শিক্ষিত যুবক-যুবতীরা চাকরি করতে আগে যেত ব্যাঙ্গালোর, মুম্বই, দিল্লি, গুরুগ্রাম, নয়ডায়; এখন তাঁরা পৌঁছে যাচ্ছে গৌহাটি, ভুবনেশ্বরেও। নিজের জমি ফেলে এরাজ্যের কৃষক কাশ্মীরে আপেল কুড়োতে গিয়ে সন্ত্রাসবাদীদের হাতে গুলি খেয়ে মরছে, আর যে কৃষক নিজের জমিতে চাষ করছে, সে ফসলের দাম না পেয়ে আত্মহত্যা করছে। এ রাজ্যে গত ১৫ বছরে কোনো নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মিত হয়নি। এরাজ্যে বিদ্যুতের দাম গোটা দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি এবং রাজ্যবাসীর মাথাপিছু আয় গোটা দেশের মধ্যে সবচেয়ে কম। রান্নার গ্যাস (এলপিজি), পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিনের দাম এ রাজ্যে সবচেয়ে বেশি। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যবিমার অধীনে কোনো সুরক্ষা পায় না রাজ্যবাসী।

বাংলা সিনেমার বাজার তামিল-তেলুগু সিনেমার বাজারের ১ শতাংশ। থিয়েটার, নাটক, কবিগান, কীর্তন, লোকগীতি, পূজাসংখ্যা, ছোটোগল্প, উপন্যাস, কবিতার বই— সবই বাজার হারাচ্ছে এই ক্ষুধার রাজ্যে। এরাজ্যের ৯৫ শতাংশ রাস্তাকে দুই লেন থেকে চার লেন করা হয়নি, রাজ্যের ৯৫ শতাংশ গ্রামে পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছায়নি, রাজ্য জুড়ে নিকাশি ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। রাজ্য সরকার ও রাজ্যের শাসক দলের পক্ষ থেকে সীমাহীন জেহাদি তোষণ ও সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মে মদতের দরুন রাজ্যজুড়ে হিন্দুরা নির্যাতিত হচ্ছে। পাড়ায় পাড়ায় ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল খেলার সংস্কৃতি বন্ধ; ভারতীয় ক্রিকেট টিম দূরের কথা, ফুটবল টিমেও এখন জায়গা পায় না পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালি। দেশের মধ্যে সবার আগে মেট্রোরেল পশ্চিমবঙ্গ পেলেও, গোটা দেশের নিরিখে কলকাতা শহরতলিতে মেট্রো নেটওয়ার্কের প্রসারে সবার শেষে সেই পশ্চিমবঙ্গ। এখানে মেট্রোরেলের কাজ বন্ধ করতে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছে রাজ্য সরকার। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে 'ইনস্টিটিউট অফ এমিনেন্স'-এর স্বীকৃতি কেন্দ্রীয় সরকার দিতে চাইলেও সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে রাজ্য সরকার। ফলে দু'হাজার কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। এছাড়াও ৪০ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে রাজ্যে গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণের কেন্দ্রীয় প্রস্তাবও ফিরিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। কেন্দ্র অনুমোদিত তিনটি পণ্যবাহী রেল করিডোর রূপায়ণের ক্ষেত্রে জমি দেয়নি পশ্চিমবঙ্গ সরকার; দমদম-বাগডোগরা বিমানবন্দর সম্প্রসারণে জমি দেয়নি রাজ্য সরকার, তিস্তা সেচ প্রকল্পের জন্য জমি দেয়নি রাজ্য সরকার। ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যানে কেন্দ্র অর্থ বরাদ্দ করার পরও প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণ করেনি পশ্চিমবঙ্গ সরকার। উত্তরবঙ্গের রায়গঞ্জে এইমসের মতো হাসপাতাল তৈরি হতে দেয়নি রাজ্য সরকার। এছাড়াও এ রাজ্যের জন্য অনুমোদিত ৬৩টি রেল প্রকল্পে জমি দেয়নি রাজ্য। বিভিন্ন স্থানে রেল ওভারব্রিজ তৈরি করতে দেননি মুখ্যমন্ত্রী। ব্যারাকপুর, বারাসাত, জোকা মেট্রো প্রকল্প বাস্তবায়নে জমি দেননি তিনি। পশ্চিমবঙ্গের মাছে-ভাতে বাঙ্গালির জন্য মাছ আসে অন্ধ্র ও বিলাসপুর থেকে। ইলিশ পাঠায় গুজরাট ও মহারাষ্ট্র। ডিম পাঠায় কর্ণাটক। ৯৯ শতাংশ ওষুধ আসে অন্য রাজ্য থেকে, কৃষিকাজের জন্য সার আসে অন্য রাজ্য থেকে। সফট্ওয়্যার হোক বা মার্কেটিং— যেকোনো বেসরকারি চাকরিতে গোটা দেশের তুলনায় বেতন এখানে সবচেয়ে কম। ২০০৯ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত বকেয়া মহার্ঘ্য ভাতা এখনও পাননি রাজ্য সরকারি কর্মীরা। প্রায় ৫ লক্ষ রাজ্য সরকারি পদ খালি। সারা দেশের মধ্যে আইসিডিএস, অঙ্গনওয়ারী ও আশা কর্মীদের মাইনে এ রাজ্যে সবচেয়ে কম। পার্শ্বশিক্ষকদের মাইনেও সবচেয়ে কম, স্থায়ী চাকরির বেতনের ২৫ শতাংশ বেতনে রাজ্যের কলেজগুলিতে অস্থায়ী অধ্যাপক নিয়োগ হচ্ছে। বাড়ছে বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়। শিক্ষাবিভাগ, স্বাস্থ্য পরিষেবা, পুলিশ— কোথাও স্থায়ী নিয়োগ নেই। সিভিক ডাক্তার, সিভিক নার্স, সিভিক টিচার, সিভিক পুলিশে ছেয়ে যাচ্ছে রাজ্য। পর্যটন স্থানগুলি হয়ে গিয়েছে তোলামূলি নেতাদের কালো টাকা সাদা করার যন্ত্র। রাজ্যের তাঁত শিল্প শেষ, চা বাগানের শ্রমিকরাও পাচ্ছে না মাইনে, পাচ্ছে না পিএফ ও ইএসআই ইত্যাদি সুবিধা। এ রাজ্যের কৃষি রপ্তানি তলানিতে, চারিদিকে চলছে জমিজমা ও সম্পত্তি লুঠ, শহরাঞ্চলে ভাড়াটিয়ারা বাড়ি ছাড়ছে না, আর সেই সব সম্পত্তি বেদখল করছে তোলামূলি নেতারা।

এইসবকিছু কিন্তু রোগের উপসর্গ। রোগ হলো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রীর অতিবামপন্থী, জেহাদি চিন্তাধারা। যে রাজনৈতিক আদর্শ তিনি গ্রহণ করেছেন, সেই অনুযায়ী তার উদ্দেশ্য রাজ্যের সাধারণ মানুষকে গরিব করে রেখে তাঁদের ভিক্ষা দেওয়া। সঙ্গে রাজ্যের মানুষের সব সাংবিধানিক অধিকার হরণ। তাই ২০১১-তেই তিনি নির্বাচনী ইস্তেহারে ঘোষণা করেন যে, কোনো উন্নয়নমূলক প্রকল্পে তিনি জমি দেবেন না এবং এ রাজ্যে কোনো এসইজেড হতে দেবেন না। তারপর দিনে দিনে উনি সরকারি নিয়োগ কমিয়ে বাড়িয়েছেন ভাতা। মানুষ যত গরিব হয়েছে, তত নির্ভরশীল হয়েছে ভাতার ওপর। পাশাপাশি চলছে দেদার দুর্নীতি ও সরকারি অর্থ লুঠ। রাজ্যের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যবসা-বাণিজ্য, সংস্কৃতি, পানীয় জল সরবরাহ, বিদ্যুৎ, সড়ক, শিল্প সব শেষ। বাঙ্গালির বাঁচার শেষ সুযোগ হলো আগামী ২৩ ও ২৯ এপ্রিল। শ্রীভগবান হয়তো এরপর আর সুযোগ দেবেন না! □

আসন্ন নির্বাচনে এই অপশাসনের অবসান হলেই পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদের রাহুমুক্তি ঘটবে

সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী

গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে পশ্চিমবঙ্গে শাসন ক্ষমতায় রয়েছেন তৃণমূলনেত্রী মমতা ব্যানার্জি। 'পরিবর্তন' ও 'সুশাসন'-এর যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এই যাত্রা শুরু হয়েছিল, আজ সেই প্রতিশ্রুতিই সবচেয়ে বড়ো প্রশ্নচিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কথায় উন্নয়ন, বাস্তবে অনিশ্চয়তা;এই বৈপরীত্যই এখন রাজ্যের রাজনৈতিক বাস্তবতার মূল সুর। চারদিকে উৎসবের চাকচিক্য, আর তার আড়ালে ধীরে ধীরে সমাজ,অর্থনীতির নিঃস্বকরণ; এই দ্বৈত বাস্তবতা চোখে পড়ছে স্পষ্টভাবে।

প্রথমে শিক্ষা ও নিয়োগ ব্যবস্থার দিকে তাকালেই দুর্নীতির গভীর চিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে। SSC, PSC এবং প্রাইমারি TET ; বিশেষ করে ২০১৬ সালের পরীক্ষাকে ঘিরে যে অস্বচ্ছতা ও অনিয়ম সামনে এসেছে, তা নিছক প্রশাসনিক ত্রুটি নয়; বরং একটি সুসংগঠিত ব্যর্থতার প্রতিফলন। মেধা তালিকা প্রকাশে গড়িমসি, প্রাপ্ত নম্বর গোপন রাখা, OMR শিটের কার্বন কপি না দেওয়া; এসবই প্রমাণ করে, স্বচ্ছতার দাবি কতটা ফাঁপা হয়ে পড়েছে। এমনকী SMS-এর মাধ্যমে ইন্টারভিউ ডাকার অভিযোগ পুরো ব্যবস্থাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। এর সঙ্গে যখন মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা যুক্ত হয়, তখন স্পষ্ট হয়ে যায় যে, শিক্ষাব্যবস্থা শুধু দুর্বল হয়নি, তার বিশ্বাসযোগ্যতাও ভেঙে পড়েছে। শিক্ষিত বেকারদের 'চপ ভাজার' পরামর্শ সেই ব্যর্থতার সবচেয়ে নির্মম প্রতীক হয়ে উঠেছে।

দুর্নীতির প্রসঙ্গে চিত্রটি আরও উদ্বেগজনক। সারদা, নারদা ও রোজভ্যালির মতো কেলেঙ্কারিগুলো কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; বরং একটি গভীরভাবে প্রোথিত দুর্নীতি-সংস্কৃতির পরিচায়ক। সাধারণ মানুষের সঞ্চয় চুরি হয়েছে, অথচ দায়বদ্ধতার প্রশ্ন আজও ধোঁয়াশার আড়ালে। জমি মাফিয়া, বালি মাফিয়া ও সিন্ডিকেট রাজ;এসব আর অভিযোগ নয়, বরং বঙ্গীয় জনজীবনের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তোলাবাজির সংস্কৃতি ব্যবসা থেকে সাধারণ নাগরিকের দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব ফেলছে। এর সঙ্গে প্রভাবশালী মহলের অস্বাভাবিক সম্পত্তি বৃদ্ধির প্রশ্ন যুক্ত হয়ে প্রশাসনের নৈতিক অবস্থানকে আরও দুর্বল করে তুলেছে।

আইন-শৃঙ্খলার ক্ষেত্রেও পরিস্থিতি আশাব্যঞ্জক নয়। পঞ্চায়েত নির্বাচনের সহিংসতা, দাড়িভিটে ছাত্র হত্যা, কামদুনির মতো ঘটনার পর বিচারপ্রক্রিয়া নিয়ে যে প্রশ্ন উঠেছে, তার সন্তোষজনক উত্তর মেলেনি। ২০১৩ সালের কামদুনির ঘটনা বা ২০২৪ সালের অভয়াকাণ্ড নারী নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক ভূমিকা নিয়ে এক গভীর প্রশ্নচিহ্ন তৈরি করে। চোলাই মদে মৃত্যুর ঘটনা প্রশাসনিক নজরদারির ঘাটতিকে সামনে আনে। গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব ও রাজনৈতিক সংঘর্ষে প্রাণহানি রাজ্যের সামাজিক স্থিতিশীলতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। বিরোধীদের কণ্ঠরোধ এবং কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগ গণতান্ত্রিক কাঠামোর উপর সরাসরি আঘাত হিসেবে প্রতীয়মান।

অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও প্রতিশ্রুতি ও বাস্তবতার ব্যবধান স্পষ্ট। ৬০ হাজার গ্রুপ ডি চাকরির প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়নি, শিল্প সম্মেলনের ফলাফল নিয়ে অনিশ্চয়তা থেকেই গেছে, বিদেশ সফরের পরও উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগের অভাব চোখে পড়ে। কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত, বেকার সমস্যা ক্রমেই প্রকট হয়েছে। উন্নয়নের যে চিত্র তুলে ধরা হয়, বাস্তবতার সঙ্গে তার মিল খুঁজে পাওয়া কঠিন। গত এক দশকে বহু শিল্প কার্যত স্তব্ধ হয়ে পড়েছে, অথচ তার সমাধানে দৃশ্যমান উদ্যোগের অভাব চোখে পড়ে।

সামাজিক নীতির ক্ষেত্রেও অগ্রাধিকারের অসামঞ্জস্য স্পষ্ট। ক্লাব, উৎসব ও মেলা-খেলায় বিপুল অর্থ বরাদ্দ করা হলেও শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের মতো মৌলিক ক্ষেত্র উপেক্ষিত থেকে গিয়েছে। ক্ষতিপূরণ ও অনুদান নীতির বৈষম্য প্রশাসনিক ন্যায্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। শিক্ষকদের ভাতা ও অন্যান্য খাতে বরাদ্দের পার্থক্য সেই অসামঞ্জস্যকেই আরও উন্মোচিত করেছে।

গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিয়েও উদ্বেগ বেড়েছে। বিরোধী মত প্রকাশে বাধা, সমালোচকদের বিরুদ্ধে তকমা প্রয়োগ এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে একপাক্ষিকতার অভিযোগ গণতন্ত্রের পরিসর সংকুচিত করেছে কি না, সেই প্রশ্ন জোরালো হয়েছে। কেন্দ্রীয় প্রকল্পের নাম পরিবর্তন করে কৃতিত্ব নেওয়ার প্রবণতাও স্বচ্ছতার অভাবকে প্রকট করেছে। বিভিন্ন জাতীয় ইস্যুতে সরকারের অবস্থান রাজ্যের রাজনৈতিক পরিবেশকে আরও মেরুকরণ করেছে।

মোল্লাতন্ত্র কায়েমের জন্য একটি বিশেষ মজহবের তোষণ ও বারবাড়ন্তকে রাজ্য সরকারের নিরপেক্ষতার মূলে কুঠারাঘাত করেছে। ইতিহাস বিকৃত করে হিন্দুদের অপমান পশ্চিমবঙ্গের মানুষ হয়তো ভুলে যাননি। ফিরহাদ হাকিমের মুখে হিন্দুদের বিরুদ্ধে যে সকল বক্তব্য ছড়িয়েছে সেগুলির জবাব দেওয়ার সময় এসেছে। হোলি মুবারক, ইনশাল্লাহ এই শব্দগুলির একটা জবাব হিন্দুরা এবার দিতে অবশ্যই ভুলবেন না। পিসি ভাইপোর যৌথ প্রয়োজনায় নাটক এখন শেষ দৃশ্যে অবতীর্ণ। নাটকের কুশীলবদেরও এরই মধ্যে চিহ্নিত করা হয়েছে। সব মিলিয়ে চিত্র একটাই — প্রতিশ্রুতি আর বাস্তবতার মধ্যে গভীর ব্যবধান। 'নৈতিক জয়' বা 'সততার প্রতীক'—এই স্লোগানগুলো অনেকের কাছেই এখন রাজনৈতিক অলঙ্কারমাত্র। বেকারত্ব, দুর্নীতি, প্রশাসনিক অস্বচ্ছতা, আইন-শৃঙ্খলার অবনতিই আজ জনআলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। গণতন্ত্রে ভোট কেবল একটি প্রক্রিয়া নয়;এটি জবাবদিহি নিশ্চিত করার হাতিয়ার। অতীতের অভিজ্ঞতা উপেক্ষা করে ভবিষ্যৎ নির্মাণ সম্ভব নয়। তাই ভেবেচিন্তে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা— এটিই আজ সবচেয়ে জরুরি।

গল্পকথায় ডাক্তারজী

(৬৮)

করাচীর কথা
করাচী শাখা

প্রচণ্ড গরম। গ্রীষ্মের নাগপুরে এটা খুব স্বাভাবিক। তারই মধ্যে ডাক্তারজী ব্যস্ত রয়েছেন মে মাসের সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গের প্রস্তুতি কার্য নিয়ে। এমন সময় একদিন বাবারাও সাভারকরের বার্তা এল— 'মে মাসের গোড়ার দিকে করাচীতে 'অখিল ভারতীয় তরুণ হিন্দু পরিষদ'-এর অধিবেশনে আপনি অবশ্যই আসবেন, বিভিন্ন স্থান থেকে এই অধিবেশনে শত তরুণ যোগদান করবে।' তাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ ডাক্তারজী হাতছাড়া করতে চাইলেন না, কিন্তু সমস্যা হলো— একদিকে সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ, অপরদিকে অর্থ-সমস্যা। আসলে করাচী যাতায়াতের অর্থ জোগাড় করা বাবারাওজীর পক্ষে কঠিন ছিল। তাঁর এই সমস্যার কথা জেনে ভাই পরমার্থ তাঁর যাতায়াতের ব্যয়ভার বহন করার দায়িত্ব নিলেন।

ডাক্তারজীকে বাবারাও সাভারকরজী পত্রে জানালেন— 'সহযোগিতার অর্থ দুজনে ভাগাভাগি করে নিলে অনেকটাই ভার লাঘব হবে।' এ ছিল তাদের বন্ধুত্বের নিদর্শন। ৩ মে বোম্বাই থেকে দুজনে একসঙ্গে করাচী যাত্রা করেন। ৬ মে ডাক্তারজী কাকা আবাজী হেডগেওয়ারকে তাঁর যাত্রা পথের যে অভিজ্ঞতার কথা লেখেন তা বড়ো তাৎপর্যপূর্ণ এবং পর্যবেক্ষণের দিক থেকে মূল্যবানও। ট্রেনে ওঠা ও জায়গা নেবার দৌড়াদৌড়ি নিয়ে যা নজরে পড়ল— 'মুসলমানদের গুন্ডামি, সুযোগ পেলে প্রথমে হুমকি, তারপর চিৎকার চেঁচামেচি, অতঃপর অনুনয়-বিনয় এবং সবশেষে শরণাগতি'। এই উদাহরণ দিয়ে ডাক্তারজী বোঝাতে চাইলেন ওদের হুমকি, গলাবাজির সামনে সোজা হয়ে দাঁড়ালে ওদের মধ্যে অবশ্য পরিবর্তন দেখা যাবে। কোথাও কোথাও ডাক্তারজী হিন্দুদের অবস্থা দেখে ক্ষোভও প্রকাশ করেছেন।

গুজরাটের কর্ণাবতী স্টেশনের এক অভিজ্ঞতার কথায় লিখেছিলেন— 'এই স্থানেও মুসলমানদের জোরজুলুম ও হিন্দুদের ঢিলেঢালা মনোবৃত্তির ভালো অভিজ্ঞতা হলো। ব্যতিক্রম স্বরূপ জনৈক গুজরাটি মহিলার নির্ভীকতা ও তেজস্বী মানসিকতার পরিচয় পেয়ে আনন্দ হলো, কিন্তু তার স্বামীর মধ্যে সেই গুণ একেবারেই দেখা গেল না। হায়দরাবাদ (সিন্ধু) স্টেশনে ট্রেনে উঠেই মনে হলো আমরা যেন কোনো মুসলমান দেশে এসে পড়েছি। করাচী পৌঁছানো পর্যন্ত আমাদের কামরায় একজনও হিন্দুকে দেখতে পেলাম না'।

করাচীতে ছয় দিন থাকাকালীন ডাক্তারজী প্রতিনিয়ত করাচী, সিন্ধু থেকে আসা বহু তরুণের সঙ্গে পরিচিত হন এবং তাদের সামনে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রসার-উন্মুখ সংগঠনের কথা তুলে ধরেন। সমস্ত কার্যকর্তা মুসলমানদের নিরন্তর অত্যাচারে এ ধরনের সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেও মিটিং মিছিল ছাড়া কোনো সংগঠন পদ্ধতি তাদের জানা ছিল না। ডাক্তারজী তাদের সংগঠন-তন্ত্র বোঝালে তারা এই মত ব্যক্ত করে যে সমস্ত দেশে এমন সংগঠনের কার্যবিস্তার একান্ত আবশ্যক। ডাক্তারজী কয়েকজন কার্যকর্তাকে নিয়ে প্রত্যক্ষ শাখা শুরু করলেন। শ্রী ডিডি চৌধুরীকে সঙ্ঘচালক নিযুক্ত করেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও সঙ্ঘকার্যে তখন যোগদান করেন। আনন্দিত মনে ডাক্তারজী ফিরে আসেন নাগপুরে।

সংকলক : বিমলকৃষ্ণ দাস